ভয়ঙ্কর ভাইরাস

অনীশ দেব



এক

ছো টকা একদৃষ্টে আরশোলাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওটার গায়ে আলো ফেললেই ওটা সুড়সুড় করে অন্ধকার লক্ষ করে ছুটছে। তারপর অন্ধকারে পৌঁছেই একেবারে চুপ। যেন মাটির তৈরি খেলনা-আরশোলা।

আসলে আরশোলাটা মাটির তৈরি নয়। মাইক্রোপ্রসেসর, আই-সি চিপ আর ধাতব যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি। ছোটকার হাতে তৈরি রোবট-আরশোলা। কিছুদিন হলো ছোটকা 'ইনসেক্ট রোবট' নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠেছে।

ল্যাবরেটরির মেঝেতে আয়েস করে বসে রোবট-আরশোলাটাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল ছোটকা। ডান হাতের দু-আঙুলের ফাঁকে সরু চুরুট। কপালে ভাঁজ, চোখ ছোট। একটা টেবিলের ছায়ার দাঁড়ানো আরশোলাটার দিকে তাকিয়ে একমনে কী যেন ভাবছে।

ছোটকার দু'পাশে বসেছিল হুবহু একইরকম দেখতে দুই রত্ন : চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত। ওরা চোখ বড়-বড় করে ওদের ছোটকার কাণ্ডকারখানা দেখছিল। সত্যি, ছোটকা যেন ইলেকট্রনিক্স-জাদুকর। সবসময় নতুন কিছু করে যমজ দুই ভাইকে তাক লাগিয়ে দেয়।

'কী ভাবছ, ছোটকা?' চন্দ্রকান্ত জিগ্যেস করল।

ঘরের দেওয়ালে ঘুরে বেড়ানো একটা টিকটিকির দিকে আঙুল দেখিয়ে ইন্দ্রকান্ত বলল, 'পরে ভাববে, ছোটকা। আগে আরশোলাটাকে এদিকে টেনে নিয়ে এসো। নইলে টিকটিকিটা নেমে এসে ওটাকে টপ করে গিলে ফেলবে। তারপর...।'

ছোটকা ইন্দ্রের দিকে ঘুরে তাকিয়ে হাসল। তারপর টর্চ জ্বেলে তাক করল আরশোলাটার গায়ে। সঙ্গে-সঙ্গে ওটা ছুট লাগাল অন্ধকার আস্তানার দিকে।

চন্দ্রকান্ত আরশোলাটার দৌড় দেখে হেসে ফেলল, 'কী দারুণ! একেবারে আসল আরশোলার মতো!'

ছোটকা গম্ভীরভাবে বলল, 'বুঝলি, ঝালা-পালা, আরশোলা দিয়ে শুরু। তবে আমার টার্গেট হলো নতুন মডেলের একটা অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফ্ট গান তৈরি করা। যার ক্যারেকটার হবে ঠিক ওই রোবট-আরশোলার মতন। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের ফাইটার প্লেন যদি ওই অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফ্ট গানের ওপরে সার্চলাইটের আলো ফ্যালে তা হলে চাকা-লাগানো ফ্রেমে বসানো বন্দুকটা অটোমেটিক কায়দায় অন্ধকারে ছুটে গিয়ে শেলটার নেবে। ইন্ডিয়ার ডিফেন্স রিসার্চ এখন এই ধরনের অটোমেটিক মোবাইল অস্ত্রশস্ত্রের ওপরে গবেষণা চালাচ্ছে—কোটি-কোটি টাকা খরচ করছে।'

চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত যমজ দুই ভাই। বাচ্চা বয়েসে ওরা কান্নাকাটি করে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করত, কান ঝালাপালা করে দিত। তাই ছোটকা ওদের নাম রেখেছে 'ঝালা-পালা'।

ছোটকা কাজ করে ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে। ডিফেন্স রিসার্চের সঙ্গেও কীরকম যেন যোগাযোগ আছে। আর ইলেকট্রনিক্স হলো ছোটকার সবচেয়ে প্রিয় নেশা। সুযোগ পেলেই নিজের ল্যাবরেটরিতে এসে ঢুকে পড়ে।

গত সাতদিনে ছোটকা তিনটে রোবট-পোকা তৈরি করেছে। একটা শুঁয়োপোকা, একটা ঝিঁঝিপোকা, আর লেটেস্ট এই আরশোলা।

চন্দ্রকান্ত অ্যান্টিএয়ারক্রাফ্ট গান নিয়ে কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, হঠাৎই শুনতে পেল খনখনে গলায় কে যেন বলছে, 'ভাইরে ভাই, আমার ভেতরে ভাই, সর্বনাশা ভাই, ওরে জবর ভাই...।'

একই সঙ্গে ধাতব পা ফেলার ঠং-ঠং আওয়াজ হচ্ছিল। চন্দ্র আর ইন্দ্র ইশারা করে চোখাচোখি করল। ছোটকা চুরুটে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'একে নিয়ে তো মহা ঝামেলা!'

বলতে-না-বলতেই ঘরে ঢুকে পড়ল হাফপ্যান্ট পরা তিনফুট হাইটের বাচ্চা-রোবট ঝামেলা। মাথাটা পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড—রুপোর মতো ঝকমক করছে।

ছোটকা ওকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আবার কী প্রবলেম হলো? তোমার ভেতরে আবার ভাই কীসের! একবার বলছ সর্বনাশা ভাই, একবার বলছ জবর ভাই—ব্যাপার বলো তো! তোমার দু-ভাই ঝালা-পালা তো এখানে বসে আছে।'

চন্দ্র বলল, 'ছোটকা, বাচ্চা-রোবট ভেতরে আর বাইরে গুলিয়ে ফেলেছে।'

ঝামেলা সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, 'না, না, এই দুই বিচ্ছু ভাইযুগলের কথা বলছি না। আরও ডেঞ্জারাস ভাই...ভাই...ভাইরাস।'

ছোটকা হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'ও, তাই বলো! বেচারা ভাইরাস বলতে গিয়ে আটকে গেছে। কীরে, ঝালা-পালা, তোরা ঠিক করে ওকে ট্রেনিং দে। কথা বলতে গিয়ে বারে-বারে আটকে যায়। তা ছাড়া এখানে ভাইরাস আসবে কোথা থেকে?'

'সে-ভাইরাস নয়। আমার অন্তরে কম্পিউটার-ভাইরাস ঘুস গিয়া।' ঝামেলা ওর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড মাথাটা নাড়তে-নাড়তে বলল। ওর কপালে লাগানো লাল-নীল-হলদে-সবুজ বাতিগুলো উলটোপালটা-ভাবে জ্বলতে-নিভতে লাগল।

'কম্পিউটার-ভাইরাস!' ছোটকা কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, 'হতে পারে। কারণ, ক'দিন ধরেই দেখছি তুমি উলটোপালটা বকে চলেছ। আপনমনে দু-হাত তুলে নাচছ আর বেড়ালের মতো মিঁউ-মিঁউ করে ডাকছ।'

ঝামেলা তখন কীর্তনীয়ার ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ মাথা দোলাচ্ছে আর হাতের আঙুলগুলো ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে তালে-তালে হাত ঘোরাচ্ছে। সেইসঙ্গে বিড়বিড় করে আওড়ে চলেছে : 'ভাইরে ভাই, ওরে জবর ভাই। আমার ভেতরে ভাই, আমার বাইরে ভাই...।'

ঝালা-পালা ঝামেলাকে কাছে ডাকল।

ঝামেলা হেলেদুলে যমজ দু-ভাইয়ের কাছে এল।

চন্দ্র জিগ্যেস করল, 'তুমি এখন কী করছিলে?'

ঝামেলা বলল, 'দোতলার বারান্দায় মর্নিং ওয়াক করছিলাম।'

মর্নিং ওয়াক! ছোটকা আঁতকে উঠল। এখন ঘড়িতে রাত আটটা বাজে। রাত আটটার সময় রোবটটা মর্নিং ওয়াক করছে!

নিশ্চয়ই ওটার ভেতরে বড়সড় কোনও গণ্ডগোল হয়েছে। হয়তো রিয়েল টাইম ক্লকটাও অকেজো হয়ে গেছে।

'তুমি রাত আটটার সময় মর্নিং ওয়াক করছ!' ইন্দ্র অবাক হয়ে বলল।

'হ্যাঁ।' ঝামেলা উদাসীনভাবে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমাদের নলেজে থাকা দরকার আমি ধীরে-ধীরে নিশাচর প্রাণী হয়ে যাইতেছি।'

এ-কথা শুনে ছোটকা আর ঝালা-পালা হাঁ করে বাচ্চা-রোবটটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঝামেলা ছোটকারই হাতে তৈরি। ঝালা-পালাকে এই বাচ্চা-রোবটটা ছোটকা প্রেজেন্ট করেছিল। সবসময় ঝামেলা বাধায় বলে ছোটকাই ওর নাম রেখেছে ঝামেলা। এখন ঝামেলা এক নতুন ঝামেলা নিয়ে হাজির হয়েছে ওদের সামনে।

বলে কী রোবটটা! ও ধীরে-ধীরে নিশাচর প্রাণী হয়ে যাচ্ছে!

ছোটকা ঝালা-পালাকে বলল, 'শোন, কেস খুব সিরিয়াস। মনে হয় কম্পিউটার-ভাইরাসের জন্যেই এরকম হচ্ছে। লাস্ট উইকে ওর প্রোগ্রামগুলো যখন আপগ্রেড করছিলাম তখন একটা ফ্লপি ওর মেমোরির সঙ্গে কানেক্ট করেছিলাম। তখনই হয়তো কোনও ভাইরাসপ্রোগ্রাম ওর মেমোরিতে ঢুকে পড়েছে।'

ঝালা-পালা ছোটকার কথা শুনল বটে, তবে ভালো করে কিছু বুঝতে পারল না।

ছোটকা বলল, 'এই চন্দ্র, আমার ঘরের টেবিল থেকে মোবাইল ফোনটা নিয়ে আয় তো!'

চন্দ্রকান্ত লাফিয়ে উঠে পড়ল। 'এক্ষুনি নিয়ে আসছি' বলে ছুট লাগাল ছোটকার ঘরের দিকে।

ঝামেলা তখন বলছে, 'আমি নকটার্নাল, আমি নিশাচর। আমি নকটার্নাল, আমি নিশাচর।'

ঝামেলার ছোটখাটো সমস্যা হলে ছোটকা নিজেই ঠিকঠাক করে দেয়। তবে ওর বড়সড় কিছু হলে ওকে পাঠানো হয় ড. প্রকাশ দেবনাথের কাছে। ড. দেবনাথ গত পনেরো বছর ধরে 'রোবট ইন-টেলিজেন্স', 'কম্পিউটার ভাইরাস' আর 'মেশিন লার্নিং সিস্টেম' নিয়ে গবেষণা করছেন। বিজ্ঞানীমহলে ওঁর গবেষণা দারুণ কদর পেয়েছে। 'রোবোটিক রিসার্চ' সংক্রান্ত কোনও ব্যাপার হলেই ভারত সরকারের উঁচুমহল থেকে ড. দেবনাথের ডাক আসে। তা ছাড়া ছোটকার 'ইনসেক্ট রোবট' গবেষণাতেও ড. দেবনাথ দরকার পড়লেই ছোটকাকে সাহায্য করছেন।

চন্দ্র ফোনটা নিয়ে এসে ছোটকার হাতে দিল। ছোটকা শেষ-হয়ে-আসা চুরুটটা হাত বাড়িয়ে একটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। তারপর ড. দেবনাথের নম্বর ডায়াল করতে শুরু করল।

ঝামেলা তখনও কীর্তনীয়ার ঢঙে নাচছিল আর ওর নিশাচর হয়ে যাওয়ার প্রবণতা নিয়ে যা-খুশি-তাই গাইছিল।

চন্দ্রকান্ত ওর দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ঝামেলা, স্ট্যাচু হয়ে কথা বন্ধ করো।'

আদেশ পাওয়ামাত্রই বাচ্চা-রোবটটা ফ্রিজ শট হয়ে গেল। ছোটকা ততক্ষণে ফোনে কথা বলতে শুরু করেছে।

'ড. দেবনাথ? আমি প্রসেনজিৎ রায় বলছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলুন। হঠাৎ কী মনে করে?'

'আর বলবেন না! আমাদের বাচ্চা-রোবটটাকে নিয়ে একটু ঝামেলায় পড়েছি...।'

'কেন, ঝামেলা আবার কী ঝামেলা করল?' ড. দেবনাথ হেসে জানতে চাইলেন।

ছোটকা বলল, 'ও তো বলছে ওর ভেতরে ভাইরাস ঢুকেছে। তারপর এও বলছে, ও নাকি ধীরে-ধীরে নিশাচর হয়ে যাচ্ছে।'

ফোনের ও-প্রান্তে প্রকাশ দেবনাথ হাসিতে ফেটে পড়লেন। একটু পরে হাসির দমক সামলে নিয়ে বললেন, 'নিশাচর হয়ে যাচ্ছে! কখনও কোনও রোবটের এই টাইপের প্রবলেম হয়েছে বলে শুনিনি। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ...।' ড. দেবনাথের হাসি আর থামতেই চায় না।

ছোটকা বলল, 'মনে হয় ওর "লার্নিং সিস্টেম"-এর মধ্যেও কোনও গোলমাল হয়েছে।'

ঝামেলার মধ্যে একটা 'লার্নিং সিস্টেম' আছে। সেটা ওকে রোজকার অভিজ্ঞতা থেকে নতুন-নতুন জিনিস শিখতে সাহায্য করে। এর ফলে ওর 'নলেজ বেস' ক্রমাগতই বাড়তে থাকে।

'ওকে নিয়ে চলে আসুন আমার কাছে। কখন আসবেন?' ড. দেবনাথ জানতে চাইলেন।

'আপনার যখন সুবিধে। যদি বলেন কাল সকালে...এই ধরুন দশটা নাগাদ...যেতে পারি।'

'উঁহু, কাল দশটায় আমার ইনস্টিটিউটে একটা মিটিং আছে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সময় নিলেন প্রকাশ দেবনাথ। তারপর বললেন, 'আজ রাতে আসতে পারেন? এলে আমার একটা দারুণ আবিষ্কার দেখাব। শুনলে আপনি চমকে যাবেন।'

'কী আবিষ্কার?'

'ফোনে বলব না—এলে বলব। শুধু এটুকু জানিয়ে রাখি, এই নতুন ব্যাপারটা নিয়ে আমি কোনও রিসার্চ পেপার ছাপাতে পারব না। তাতে সাঙ্ঘাতিক বিপদ হবে।'

ছোটকার ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ সরু হলো।

এমন আবিষ্কার যেটা গোপন রাখাই ভালো!

ড. প্রকাশ দেবনাথ আগে কখনও এরকম কথা বলেননি। বরং উৎসাহ নিয়ে নতুন আবিষ্কারের কথা ছোটকাকে জানিয়েছেন। বলেছেন, 'মিস্টার রায়, আপনাকে জানিয়ে রাখলাম, কারণ, কখনও দরকার পড়লেই আমাকে ডাক দেবেন। দেশের জন্যে জান হাজির।'

সেই বিজ্ঞানীর মুখে আজ এরকম কথা!

'আপনার এই নতুন আবিষ্কার জানা-জানি হলে কার সাঙ্ঘাতিক বিপদ হবে?' ছোটকা জিগ্যেস করল।

'আপনার, আমার, সবার। পৃথিবীর কোনও দেশ সেই বিপদের আওতা থেকে বাদ যাবে না।' ড. দেবনাথ সিরিয়াস গলায় বললেন।

'ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি ঝামেলাকে নিয়ে রওনা হচ্ছি। মনে হচ্ছে, আধঘণ্টার মধ্যেই আপনার বাড়ি পৌঁছে যাব।'

মোবাইল ফোন অফ করে দিল

ছোটকা।

তারপর ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল।

ছোটকার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, ছোটকা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছে।

ছোটকা শূন্য চোখে ল্যাবরেটরির একটা জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু চোখ খোলা থাকলেও কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। ভুলে গেছে রোবট-আরশোলার কথা, ঝালা-পালার কথা, এমনকী ঝামেলার কথাও।

'কী হলো, ছোটকা?' চন্দ্র অধৈর্য হয়ে জিগ্যেস করল।

ছোটকা যেন চমকে উঠল। বলল, 'শোন, তোরা লেখাপড়া নিয়ে বসে যা, নইলে বউদি চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। আমি ঝামেলাকে নিয়ে বেরোচ্ছি—ড. দেবনাথের বাড়ি যাচ্ছি। মনে হয় ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।'

ইন্দ্রকান্ত বলল, 'ঝামেলা, স্ট্যাচু কাটাকুটি—।'

এ-কথা বলামাত্রই ঝামেলা একটা লম্বা হাই তুলে বলল, 'ভোর হয়ে গেছে? এক কাপ চা দাও—।'

ছোটকা বলল, 'ব্যাটা নিশাচরের অভিনয় করছে নাকি রে?'

চন্দ্র বলল, 'কে জানে! আবার ভাইরাসও হতে পারে।'

ছোটকা ঝামেলাকে লক্ষ করে বলল, 'ডাক্তারখানায় চলো। সেখানেই বোঝা যাবে তোমার অসুখটা আসলে কী। সত্যি-সত্যি তোমার ভেতরে ভাইরাস ঢুকেছে, নাকি তুমি এঁচোড়ে পাকা হয়ে উঠেছ...।'

ঝামেলা বলল, 'এঁচোড় পাকলে কাকের কী।'

ইন্দ্রকান্ত ওর ভুল শুধরে দিয়ে বলল, 'ভুল হলো, ঝামেলা। কথাটা হচ্ছে, বেল পাকলে কাকের কী।'

ঝামেলা ওর বড়-বড় কাচের গুলির মতো চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'জানি, জানি। জ্ঞান দেওয়াটা এই যমজদিগের হ্যাবিট হইয়া গিয়াছে। শোনো বৎসগণ, বেলটা আসলে বড় একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে বলিয়া বেল চেঞ্জ করিয়া এঁচোড় করে দিলাম।'

ছোটকা ওর হাত ধরে টান মারল। ঝামেলার ঢং নকল করে বলল, 'চলো, চলো, ঢের পাকামি হইয়াছে।'

দুই

পৌনে ন'টা নাগাদ ড. প্রকাশ দেবনাথের বাড়িতে পৌঁছে গেল ছোটকা।

সল্ট লেকের এই ব্লকে সবুজ বাগান দিয়ে ঘেরা চমৎকার দোতলা বাড়ি। সদর দরজার কাছে সাদা আলো জ্বলছে। সেই আলোয় নুড়ি-ছড়ানো পথটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বাড়ির পাশ ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করল ছোটকা। তারপর ঝামেলাকে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগোল।

নুড়ির ওপর পা ফেলে হাঁটতে ঝামেলার বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। তাই ছোটকা ঝামেলার হাত ধরে সামাল দিচ্ছিল—যাতে পঞ্চাশ কেজি ওজনের নেড়া মাথা রোবটটা কাত হয়ে পড়ে না যায়।

সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মাথার ওপরে একটা নীল বাতি দপ করে জ্বলে উঠল। দরজার পাশেই লুকনো স্পিকার থেকে একটি মেয়েলি কণ্ঠ বলে উঠল : 'ড. প্রকাশ দেবনাথের বাড়িতে আপনাকে স্বাগত জানাই। দয়া করে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ব্যবহার করে নিজের পরিচয় জানান।'

ছোট্ট একটা ঘষা কাচের জানলায় আলো জ্বলে উঠল। তার নিচে লেখা : 'এখানে বুড়ো আঙুল চেপে ধরুন।'

ছোটকা এতটুকু অবাক হলো না। কারণ, ড. দেবনাথের বাড়িতে ছোটকা আগেও বহুবার এসেছে। বাড়ি আর ল্যাবরেটরিকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রকাশ দেবনাথ বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

রেকর্ডেড ভয়েসের নির্দেশমতো ঘষা কাচের জানলায় বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল চেপে ধরল ছোটকা। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যান্ত্রিক ঢঙে কথা শোনা গেল : 'পরীক্ষা করে পরিচয় যাচাই করা হয়েছে। প্রসেনজিৎ রায়কে ভেতরে আসতে অনুরোধ করছি।'

একটা স্লাইডিং প্যানেল পাশে সরে গিয়ে বাড়িতে ঢোকার পথ খুলে গেল। ছোটকা আর ঝামেলা ভেতরে ঢুকল। স্লাইডিং প্যানেল আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ঝামেলা আপনমনেই বলে উঠল, 'গোটা বাড়িটায় কেমন যেন যন্ত্র-যন্ত্র গন্ধ।'

ছোটকা ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'যন্ত্র কখনও যন্ত্রের গন্ধ পায়!'

ঝামেলা অভিমানে ছোটকার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। নিজেকে যন্ত্র ভাবতে ওর ভালো লাগে না।

আলো-ঝলমলে ড্রইংরুমে ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। ঝামেলা দু-চোখের ওপরে হাতের পাতা রেখে আলো আড়াল করার চেষ্টা করছিল আর বিড়বিড় করে বলছিল, 'এখন বুঝিতে পারিতেছি, দিনের বেলা পেঁচকের কত কষ্ট।'

হঠাৎই ড্রইংরুমের শেষপ্রান্তের একটা দরজা খুলে গেল। একজন লোক ছোটকাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

লোকটার চলার ভঙ্গিতে কেমন একটা হ্যাঁচকা মারা টান চোখে পড়ল। তারপর, আরও কাছে এলে, ছোটকা লক্ষ করল ওর মুখে একটা তেল-চকচকে ভাব। তা ছাড়া মাথার চুলও এমন পরিপাটিভাবে ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো, মনে হচ্ছে যেন প্লাস্টিকের তৈরি।

লোকটার পরনে গাঢ় রঙের ফুলপ্যান্ট, ফুলহাতা চেক শার্ট। চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা। শরীরের তুলনায় পা দুটোকে সরু-সরু মনে হচ্ছে। আর ওর বাঁ হাতের পাঞ্জা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিল। কারণ, ছোটকার সূক্ষ্ম নজর বুঝতে পারল, ওটা স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি।

ছোটকার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল লোকটা। ডান হাত সামনে বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেক করার জন্য। তারপর বলল, 'আসুন, মিস্টার রায়, ডক্টর দেবনাথ আপনার জন্যে ল্যাবরেটরিতে ওয়েট করছেন।'

লোকটার গলার স্বর বেশ গম্ভীর, তবে তার সঙ্গে কোথায় যেন একটু ধাতব উপসুর মিশে রয়েছে।

ড. দেবনাথের বাড়িতে এসে এই লোকটাকে ছোটকা আগে কখনও দ্যাখেনি। তাই জিগ্যেস করল, 'আপনি কে?'

'আমার নাম রোবিদাস। র-এ ও-কার, ব-এ হ্রস্ব-ই...।'

'থাক, থাক—আর বানান করতে হবে না।'

ছোটকা বুঝল, রোবিদাস প্রকাশ দেবনাথের সাম্প্রতিক মডেলের রোবট। কিন্তু ওর বাঁ হাতটা স্টিলের কেন? মানুষের-মতো-দেখতে রোবট তৈরি করতে চাইলে স্টিলের ওপরে পলিমারের চামড়া সেঁটে দেওয়াটাই রেওয়াজ। শুধু বাঁ হাতের পাঞ্জাটুকু ঢাকা না দেওয়ার মানে কী?

'রোবিদাস' নামটা মনে-মনে আওড়াল ছোটকা। রোবোট আর যন্ত্রদাস শব্দ দুটো জুড়ে কি নামটা ড. দেবনাথ তৈরি করেছেন।

ঝামেলা অবাক হয়ে রোবিদাসকে দেখছিল। কারণ, রোবটের মতো দেখতে নয় এমন রোবট ও আগে কখনও দ্যাখেনি। কিংবা দেখলেও বুঝতে পারেনি।

ওরা তিনজনে যখন ড. দেবনাথের ল্যাবের দিকে এগোচ্ছে তখন ছোটকার নজর এড়িয়ে রোবিদাস ঝামেলাকে মুখ ভ্যাংচাল। জবাবে ঝামেলা রোবিদাসকে লাথি দেখাল।

রোবিদাস চাপা গলায় বলল, 'অ-অসভ্য, ছোটলোক...।'

ঝামেলা চোখ পাকিয়ে বলল, 'ব্যাটা লোহা-লক্কড় দিয়ে তৈরি বডেড লেবার।'

ছোটকা পিছন থেকে কথাবার্তার আঁচ পেয়ে ঘুরে তাকাল। তারপর ঝামেলাকে ধমক দিল : 'ঝামেলা, কী হচ্ছে! জলদি এসো!'

ঝামেলাকে নিয়ে এই এক মুশকিল। কোনও রোবট ওকে কিছু বললেই ও মুখিয়ে ওঠে। ওর ধারণা, রোবটদের মধ্যে ও সবচেয়ে উন্নত। আর মানুষ বহু বিবর্তনের পর রোবটে এসে পৌঁছেছে।

ছোটকা আর ঝামেলা ল্যাবের কাচের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে গেল।

একগাল হাসি নিয়ে ছোটকাকে স্বাগত জানালেন প্রকাশ দেবনাথ।

ল্যাবটা মাপে বেশ বড়—অন্তত কুড়ি ফুট বাই কুড়ি ফুট। তার সঙ্গে লাগোয়া একটা অ্যান্টিচেম্বার আছে। ছোটখাটো



মিটিং থাকলে সেখানে সেরে নেওয়া যায়। আর তার পাশেই সফ্‌টওয়্যার রুম।

ল্যাবটা এয়ারকন্ডিশনড। পাঁচটা কম্পিউটার এদিক-ওদিক বসানো। তার মধ্যে দুটো চালু রয়েছে। এ ছাড়া নানানরকম মিটার আর যন্ত্রাংশ তিনটে ওয়ার্ক টেব্‌ল-এ গাদাগাদি করে রয়েছে। দুটো ক্যাথোড রে অসিলোস্কোপও নজরে পড়ল।

ল্যাবে খুব হালকাভাবে আনন্দের সুর বাজছে—প্লেন ল্যান্ডিং-এর পর যেরকম ফুর্তির সুর বাজানো হয় অনেকটা সেইরকম। ড. দেবনাথ বলেন, এতে নাকি ঝরঝরে তরতাজা মেজাজে গবেষণা করা যায়। মিউজিক সিস্টেমের স্পিকারগুলো দেওয়ালে কোনও প্যানেলের আড়ালে বসানো—তাই চোখে পড়ছে না।

ড. দেবনাথ একটা কম্পিউটারে বসে কাজ করছিলেন। ছোটকাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন : 'আরে আসুন, বসুন। অনেকদিন পর দেখা হলো।'

ছোটকা একটা চেয়ারে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ঝামেলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আমার সৃষ্টি ঝামেলা এখন অনাসৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উলটোপালটা বকবক করে আমাদের সবার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে।'

'কোনও চিন্তা করবেন না,' ঝামেলার কাছে গিয়ে ওর নেড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন প্রকাশ দেবনাথ : 'কালকের মধ্যেই ওকে মেরামত করে দিচ্ছি। আগে ওর অ্যাক্টিভিটি সুইচটা অফ করে কম্পিউটারে হুক-আপ করে রুটিন প্রোগ্রামগুলো চেক-আপ করতে হবে।'

রোবিদাস একটু দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ড. দেবনাথ ওকে ইশারায় কাছে ডাকলেন।

রোবিদাস এগিয়ে আসতেই ঝামেলার সুইচটা অফ করে দিলেন প্রকাশ দেবনাথ। বললেন, 'এই রোবটটাকে সফ্‌টওয়্যার রুমে নিয়ে গিয়ে রেসিডেন্ট রুটিনগুলো চেক করে নাও। তারপর "সুপারস্ক্যান" অ্যান্টি-ভাইরাস প্রোগ্রামটা চালিয়ে ভাইরাস ডিটেক্ট করো। তারপর সেগুলো ক্লিন করা যায় কি না দ্যাখো।'

রোবিদাস 'ইয়েস, স্যার' বলে পঞ্চাশ কেজি ওজনের বাচ্চা রোবটটাকে অবহেলায় পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তারপর আয়েস করে পা ফেলে—যেন বাগানে পায়চারি করতে বেরিয়েছে—হাঁটা দিল সফ্‌টওয়্যার রুমের দিকে।

রোবিদাস ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ছোটকা বলল, 'এটাই আপনার নতুন আবিষ্কার?'

প্রকাশ দেবনাথ সামান্য চমকে উঠে বললেন, 'না, না—এই রোবো-অ্যানড্রয়েডটা মাসদেড়েক হলো তৈরি করেছি। আমার ল্যাবে বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করার জন্যে একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট দরকার হয়ে পড়েছে। মানুষের পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব নয়। আবার সাধারণ ডোমেস্টিক মোবাইল রোবট দিয়েও কাজ হবে না। তাই একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি দিয়ে চৌকস করে রোবিদাসকে তৈরি করেছি। নামটা রেখেছি রোবট আর যন্ত্রদাস অ্যামালগাম করে। আর-একটা ব্যবস্থা রেখেছি—যখনই ও কাউকে নিজের পরিচয় দেয়, তখন নামের বানানটাও শুনিয়ে দেয়...।'

প্রকাশ দেবনাথ হাসলেন।

ছোটকাও হেসে বলল যে, হ্যাঁ, পরিচয় দেওয়ার সময় রোবিদাস ছোটকাকেও

নামের বানানটা বলছিল।

'ওর বাঁ হাতটা ওরকম ইস্পাতের খোলামেলা রেখে দিয়েছেন কেন? পলিমারের কোনও চামড়ার কোটিং দেননি... অথচ শরীরের বাকি অংশটা...।'

ছোটকার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মুচকি হাসলেন ড. দেবনাথ : 'প্রথমে ভেবেছিলাম রোবিদাসকে অ্যাডভান্সড মডেলে বানাব। তাতে ওকে দেখতে হুবহু মানুষের মতো হতো। এমনকী চামড়া, পেশি-টেশি সবই আসল বলে মনে হতো। পরে ভাবলাম, না, ও যে মানুষ নয়, রোবট, সেটা সবাইকে আমি জানাতে চাই। কারণ, যন্ত্র যন্ত্রই—সেটা ভুললে আমাদের চলবে না। রোবট যতই "বুদ্ধিমান" হোক, তার জায়গা সবসময় মানুষের নিচে—এমনকী সবচেয়ে নির্বোধ মানুষেরও নিচে।'

প্রকাশ দেবনাথকে খানিকটা উত্তেজিত মনে হলো।

ছোটকা বিখ্যাত বিজ্ঞানীটিকে খুঁটিয়ে দেখছিল।

মুখটা রোগাটে। তাকে ঘিরে কাঁচাপাকা চাপদাড়ি। ঠোঁটের ওপরে মানানসই গোঁফ। হাই পাওয়ারের চশমার কাচের আড়ালে দুটো বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো চোখ। চোখের পাতা ঘন-ঘন পড়ছে। আর বাঁ গালে টোল পড়ার গর্ত।

'ইন্সটিটিউট অফ রোবোটিক্স'-এর সিনিয়ার সায়েন্টিস্ট প্রকাশ দেবনাথ। এরকম আপাদমস্তক সিরিয়াস বিজ্ঞানী ছোটকা খুব কমই দেখেছে। বিজ্ঞানের গবেষণা ছাড়াও ইন্ডাস্ট্রির বহু রিসার্চ প্রজেক্ট ড. দেবনাথের দায়িত্বে রয়েছে।

ড. দেবনাথ বিয়ে করেননি। বিয়ের কথা কেউ বললে বলেন, 'বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।' বাবা-মা-কে নিয়ে সল্ট লেকের এই বাড়িতে থাকেন। তবে চব্বিশ ঘণ্টার বেশিরভাগ সময়টাই ল্যাবে পড়ে থাকেন।

'এবার আপনার বিপজ্জনক আবিষ্কারের কথা বলুন।'

ড. দেবনাথ একটু যেন চমকে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ, বলছি।' তারপর একটা কম্পিউটারের কাছে গিয়ে চেয়ারে বসে খটাখট করে কয়েকটা বোতাম টিপলেন, ছোটকার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'এই মনিটরটার দিকে তাকান, রায়সাহেব।'

ছোটকা মনোযোগ দিয়ে তাকাল কম্পিউটারের রঙিন পরদার দিকে। এবং অবাক হয়ে গেল।

কম্পিউটারের মনিটরে অসংখ্য ইংরেজি অক্ষর ঢেউ খেলিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে—যেন নদীর জলে শ্যাওলা। তারপর অক্ষরগুলো একে-একে টপটপ খসে পড়তে লাগল নিচে—'স্ট্যাটাস বার'-এর ওপরে, এবং চোখের সামনে উধাও হয়ে যেতে লাগল।

ছোটকা কম্পিউটারে এরকম ভুতুড়ে কাণ্ড কখনও দ্যাখেনি। তাই চেয়ারটা কম্পিউটারের দিকে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে মনিটরের ওপরে প্রায় ঝুঁকে পড়ল, ভালো করে দেখতে চাইল ব্যাপারটা।

মিনিট পাঁচেক ধরে চলল ড. প্রকাশ দেবনাথের 'ম্যাজিক'। তারপর কয়েকটা বোতাম টিপে তিনি কম্পিউটার 'শাট ডাউন' করে দিলেন। চেয়ারটা ছোটকার মুখোমুখি ঘুরিয়ে নিয়ে বসলেন। উজ্জ্বল চোখে ছোটকাকে প্রায় মিনিটখানেক ধরে দেখলেন।

অবশেষে আলতো গলায় বললেন, 'দিস ইজ মাই ডেঞ্জারাস ডিসকভারি। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান কম্পিউটার-ভাইরাস। ইউনিক ভাইরাল প্রোগ্রাম। একে কিছুতেই ধ্বংস করা যায় না। তাই আমি এর নাম রেখেছি "অবিনাশ-২০০২"। দ্য আলটিমেট ভাইরাস প্রোগ্রাম।'

ছোটকা কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকাল। সেখানে এখন নিরীহ স্বাভাবিক ছবি। একটু আগেই যে পরদায় অভিনব ঘটনা ঘটে গেছে তা বোঝার কোনও উপায় নেই।

'অবিনাশকে আপনি বিপজ্জনক বলছেন কেন?' ছোটকা জানতে চাইল।

'বিপজ্জনক, কারণ, একবার কম্পিউটারে ঢুকে পড়লে এর হাত থেকে আর নিস্তার নেই। কম্পিউটারে সবরকম মেমোরিতে গোলমাল বাধিয়ে যত ডেটা স্টোর করা আছে সব একেবারে তছনছ করে দেবে। তা ছাড়া ধরুন কোনও নেটওয়ার্কিং সিস্টেমে অনেকগুলো কম্পিউটার জুড়ে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা আছে। এই ভাইরাস সেই নেটওয়ার্কের যে-কোনও একটা কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দিলেই কেল্লা ফতে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই নেটওয়ার্ক সিস্টেম পুরোপুরি কোলাপ্‌স করে যাবে।'

ছোটকার ভুরু কুঁচকে গেল, চোখ সরু হলো। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে জিগ্যেস করল, 'কোনও অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম দিয়ে এটাকে শায়েস্তা করা যাবে না?'

'না—যাবে না। কারণ, সাধারণত অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রামগুলো ভাইরাল প্রোগ্রামের "সিগনেচার" খোঁজে—সিগনেচার মানে, ভাইরাল প্রোগ্রামের বিশেষ একটা সাঙ্কেতিক কোড। তারপর ওরা ভাইরাস তাড়ানোর কাজ শুরু করে। আমার তৈরি এই ভাইরাস প্রোগ্রামটা বারে-বারে নিজের সিগনেচার বদলায়। রোগ-জীবাণুর ভাইরাস যেমন মিউটেট করে, অনেকটা সেইরকম। এ ধরনের কম্পিউটার ভাইরাসকে "পলিমরফিক ভাইরাস" বলে। আমার তৈরি অবিনাশ-২০০২ হলো পলিমরফিক ভাইরাসের শেষ কথা।'

'তা হলে তো ইন্টারনেটে এই ভাইরাস ঢুকিয়ে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!'

'হ্যাঁ, যাবে—গোটা "সাইবারস্পেস"টা দূষিত হয়ে যাবে। সারা পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা লাটে উঠবে। তা হলেই বুঝুন, এই ভাইরাসটা কীরকম ডেঞ্জারাস!'

'কোনও ক্রিমিনাল যদি এই ভাইরাস প্রোগ্রামটা হাতে পায় তা হলে...।'

'তা হলে আর রক্ষে নেই।' ছোটকার কথা শেষ করলেন প্রকাশ দেবনাথ, 'যদি কোনও ক্রিমিনাল এই ভাইরাস হাতে পেয়ে কোনও দেশের ব্যাঙ্কিং কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আর ডিফেন্স কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ঢুকিয়ে দেয়, তা হলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আর ডিফেন্স ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। নেটওয়ার্কগুলো এমনভাবে করাপটেড হয়ে যাবে যে, আর ওগুলো ঠিক করা যাবে না।' একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেললেন ড. দেবনাথ। তারপর বললেন : 'সেইজন্যেই বলছিলাম, আমার এই নতুন আবিষ্কার জানাজানি হলে আপনার, আমার—সবার বিপদ। পৃথিবীর কোনও দেশই সেই বিপদের হাত থেকে বাঁচবে না।'

'তা হলে এরকম একটা আবিষ্কার আপনি করতে গেলেন কেন?'

'ইচ্ছে করে কি আর করেছি!' মুখ নিচু করে হতাশায় মাথা ঝাঁকালেন ড. দেবনাথ : 'মাস ছয়েক ধরে আমি নতুন ধরনের অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম নিয়ে রিসার্চ করছিলাম। এই করতে-করতে একেবারে আচমকাই অবিনাশকে আবিষ্কার করে ফেলি। তারপর বেশ কয়েকদিন ধরে ওটা নিয়ে গবেষণা করে যখন বুঝতে পারলাম কী ভয়ঙ্কর জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছি, তখন ভয় পেয়ে গেলাম। মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে বসে রইলাম। সেই-জন্যেই আপনাকে বলেছি, টেলিফোনে বলা যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা তো কাউকে-না-কাউকে জানানো দরকার। নিজের আবিষ্কারের কথা কাউকে বলতে না পারলে ভীষণ কষ্ট হয়। আপনাকে আমি সবচেয়ে বিশ্বাস করি...তাই আপনাকে বললাম।'

ছোটকা গালে কয়েকবার হাত ঘষল। একটা কম্পিউটারের মনিটরের দিকে আনমনাভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'আপনার এই অবিনাশের কথা আর কে-কে জানে?'

'আপনি আর আমি—এ ছাড়া আর কেউ না।'

রোবিদাস কখন ঘরে ঢুকে পড়েছে ওরা কেউই খেয়াল করেনি। তাই রোবিদাস যখন কথা বলল, তখন দুজনেই সামান্য চমকে উঠল।

রোবিদাস গম্ভীর গলায় বলল, 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, ড. দেবনাথ। ওই রোবটটার মধ্যে তিন রকমের ভাইরাস পা-পা-পাওয়া গেছে : "ফ্লু মাঞ্চু", "স্টোক্রাইম" আর "ডাইহার্ড-ফোর"। এখন সেগুলোর ক্লিনিং অ-অ-অপারেশন চলছে। ভাইরাসগুলো প-প-পরিষ্কার হয়ে গেলে আপনাকে জানাব। তখন যদি অ-অ-অন্য কোনও প-প-পরীক্ষা করতে বলেন করব।'

ড. দেবনাথ একটু বিরক্ত হয়ে হাত নেড়ে বললেন, 'ঠিক আছে—তুমি যাও, ঝামেলার কাছে থাকো।'

রোবিদাস নিখুঁত ছন্দে হেঁটে সফ্‌টওয়্যার রুমের দিকে চলে গেল।

ছোটকা জিগ্যেস করল, 'রোবিদাস কি তোতলা? ঝামেলারও মাঝে-মধ্যে দু-একটা কথা আটকে যায়।'

ড. দেবনাথ হেসে বললেন, 'না, তোতলা নয়—তবে ওর ভয়েস সিন্‌থিসিস সিস্টেমে একটু ডিফেক্ট রয়ে গেছে। "অ" কিংবা "প" দিয়ে কোনও শব্দ শুরু হলে ও সেটা হোঁচট না খেয়ে উচ্চারণ করতে পারে না। যাই হোক, অবিনাশের ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী বলুন...।'

ছোটকা বলল, 'পরামর্শ একটাই : আর কেউ যেন অবিনাশের কথা জানতে না পারে।' হঠাৎ কী ভেবে আরও বলল, 'আচ্ছা, অবিনাশকে একেবারে মুছে ফেলা যায় না? তা হলে এই বিপজ্জনক ভাইরাসের আর কোনও চিহ্ন থাকবে না...।'

ড. দেবনাথ হাতের নখ খুঁটতে-খুঁটতে বললেন, 'এভাবে কি নিজের আবিষ্কারকে ধ্বংস করে ফেলতে মন চায়!'

ছোটকা কোনও জবাব দেওয়ার আগেই ল্যাবের এককোণে রাখা সবুজ রঙের টেলিফোনটা হঠাৎই বাজতে শুরু করল।

ড. প্রকাশ দেবনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন।

'হ্যালো, ড. প্রকাশ দেবনাথ স্পিকিং...।'

টেলিফোনের ও-প্রান্তে কেউ অদ্ভুতভাবে হাসল। তারপর ব্যঙ্গ মেশানো হিংস্র গলায় বলল, 'ড. প্রকাশ অবিনাশ দেবনাথ? নাকি অবিনাশের সঙ্গে টু থাউজ্যান্ড টু-টাও বলতে হবে?'

ড. দেবনাথের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রিসিভার-ধরা হাতটা ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল।

'কে? কে আপনি?' ভয়ার্ত গলায় জিগ্যেস করলেন।

'ধরে নিন আমার নামও অবিনাশ—তবে পদবি ভাইরাস নয়, চাকলাদার।' কথা শেষ হওয়ার পর আবার সেই চাপা হাসি।

ছোটকা ড. দেবনাথকে লক্ষ করছিল। তাঁর ফ্যাকাসে মুখ আর ঠকঠকানি দেখে ছুটে চলে গেল তাঁর পাশে।

'কী হয়েছে, ড. দেবনাথ? কে ফোন করেছে?'

ড. দেবনাথ ফ্যালফ্যাল করে ছোটকার দিকে তাকিয়ে রইলেন—কোনও কথা বলতে পারলেন না।

অবিনাশ চাকলাদার তখন বলছে, 'অবিনাশ-২০০২ ভাইরাসটা আমার চাই, প্রকাশবাবু। তা না হলে আপনাকে খতম করে দেব।'

তারপরই লাইনটা কেটে গেল।

ড. প্রকাশ দেবনাথ তখন এয়ার-কন্ডিশন্‌ড ল্যাবে দাঁড়িয়েও কুলকুল করে ঘামছেন।

তিন

ছোটকা কয়েক সেকেন্ড ধরে তাকিয়ে রইল প্রকাশ দেবনাথের দিকে। তারপর ওরা দুজনে ফিরে এসে দুটো চেয়ারে বসল।

ছোটকা জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, কে ফোন করেছিল? আপনি এত ভয় পেয়ে গেলেন কেন?'

ড. দেবনাথ অবিনাশ চাকলাদারের কথা বললেন।

'কে এই অবিনাশ চাকলাদার? এই নামে কাউকে চেনেন?'

মাথা নাড়লেন প্রকাশ দেবনাথ : 'না, চিনি না—।'

'ভয়েসটা কি চেনা মনে হলো? হয়তো আপনার জানাশোনা কেউ গলার স্বর বদলে ফোন করেছিল!'

'সেরকম তো মনে হলো না! কিন্তু লোকটা খবরটা পেল কেমন করে?'

'যেভাবেই পেয়ে থাক—পেয়েছে এখান থেকেই।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন চিন্তা করল ছোটকা—তারপর

জিগ্যেস করল, 'আপনার রিসার্চের সঙ্গে কারা-কারা যুক্ত আছে?'

'সে-কথা আমিও ভাবছি...' বিড়বিড় করে বললেন ড. দেবনাথ, 'দুজন রিসার্চ স্কলার আমার সঙ্গে এই ল্যাবে কাজ করে। এ ছাড়া আমার ইনস্টিটিউটের তিনজন সায়েন্টিস্ট আমার সঙ্গে জয়েন্টলি রিসার্চ করে। আমাদের রিসার্চ গ্রুপ থেকে যত রিসার্চ পেপার আমরা পাবলিশ করেছি তার সবক'টাতে আমাদের ছ'জনেরই নাম রয়েছে। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও মনকষাকষি নেই—আমাদের সম্পর্ক এককথায় দারুণ। আমাকে প্রত্যেকেই খুব ভালোবাসে, রেসপেক্ট করে—।'

কোন এক ফাঁকে ছোটকা পকেট থেকে একটা ছোট ডায়েরি বের করে ফেলেছিল। তাতে কীসব লিখতে-লিখতে জিগ্যেস করল, 'আপনার ভাইরাস নিয়ে রিসার্চের কথা বাকি পাঁচজন জানত?'

'অবশ্যই জানত। একসঙ্গে কাজ করি—জানবে না!'

'তা হলে অবিনাশ...।'

'না, অবিনাশের কথা আপনি আর আমি ছাড়া কেউ জানে না।' বেশ জোরের সঙ্গে বললেন প্রকাশ দেবনাথ।

'তা হলে অবিনাশ চাকলাদার খবর পেল কোথা থেকে?'

'সেটাই তো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।' প্রকাশ দেবনাথের মুখে কেমন একটা বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মিস্টার রায়—খবরটা অবিনাশ চাকলাদার পেয়েছে আমার এই ল্যাব থেকেই...।'

'অবিনাশ-২০০২ ভাইরাসটা যে সর্বনেশে সেটা আপনি কবে বুঝতে পারলেন?'

'ছ'দিন আগে। সেদিন প্রথম বুঝতে পারলাম, বাজারে চালু কোনও অ্যান্টি-ভাইরাস প্রোগ্রাম দিয়ে অবিনাশকে শায়েস্তা করা যাবে না। কারণ, সেদিন আমার টেস্টিং কমপ্লিট হয়েছিল। তখন আমি আমার তৈরি কয়েকটা অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম অবিনাশের ওপরে অ্যাপ্লাই করি। তাতেও কোনও কাজ হয়নি। তখনই নাম রাখলাম অবিনাশ-২০০২।' হঠাৎ কী ভেবে ড. দেবনাথ রীতিমতো আঁতকে উঠে বললেন, 'আরে! এই ভাইরাসটার যে নাম রেখেছি অবিনাশ-২০০২ সেটাই বা ওই অবিনাশ চাকলাদার জানল কেমন করে?'

ছোটকা একচিলতে হেসে বলল, 'সেটাই তো তখন থেকে ভেবে চলেছি।'

'আপনি এত প্রশ্ন করায় একটা কথা মনে পড়ছে।' হাতে হাত ঘষলেন প্রকাশ দেবনাথ। ঠোঁটের ওপরে আঙুল রেখে কয়েক লহমা কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'ভাইরাসটার কী নাম রাখা যায় সেটা আমি ভাবছিলাম, আর একটা কাগজে নানানরকম নাম লিখছিলাম। প্রায় গোটা তিরিশেক নাম লেখার পর অবিনাশ নামটা আমার মাথায় আসে। তখন সঙ্গে ২০০২-টা জুড়ে দিই। তারপর...তারপর...বাকি নামগুলো কেটে দিয়ে সেই কাগজটা ল্যাবের লিটার বিনে ফেলে দিই...।'

কথা শেষ না করেই ল্যাবের একটা ওয়ার্ক টেবিলের দিকে প্রায় ছুটে গেলেন ড. দেবনাথ। টেবিলটার নিচে একটা বাজে কাগজের ঝুড়ি রাখা ছিল। সেটার কাছে উবু হয়ে বসে ঝুড়িটা উপুড় করে ঢেলে দিলেন মেঝেতে। তারপর পাগলের মতো ছেঁড়া দলাপাকানো কাগজগুলো হাঁটকাতে লাগলেন।

কয়েক মিনিট ধরে খোঁজাখুঁজি করার পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ছোটকার কাছে এসে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন, 'কাগজটা নেই! অথচ ওই লিটার বিনেই আমি ফেলেছি। আর আমার অর্ডার না পেলে সুইপার লিটার বিন পরিষ্কার করে না।' বারকয়েক মাথা চুলকোলেন : 'কোথায় গেল বলুন তো কাগজটা?'

'অবিনাশ চাকলাদারের কাছে।' হেসে বলল ছোটকা। তারপর সিরিয়াস গলায় যোগ করল, 'আমার মোটামুটি যা জানার জেনেছি। কাল সকাল দশটা নাগাদ আমি আপনার কাছে আসব। আপনার দুই স্কলার আর তিনজন কো-ওয়ার্কার-এর সঙ্গে কথা বলব। আর আপনি আজ রাতে বা কাল সকালে যদি আবার কোনও ভয়-দেখানো ফোন পান তা হলে বলবেন আপনি অবিনাশ চাকলাদারের যে-কোনও প্রস্তাবে রাজি আছেন। তারপর আমি এসে যা করার করব। তবে আপনি চাকলাদারের গলাটা খুব খুঁটিয়ে খেয়াল করবেন—যদি চেনা কোনও গলার আদল খুঁজে পান।'

প্রকাশ দেবনাথ ছোটকার কথায় বাধ্য ছেলের মতো ঘন-ঘন ঘাড় নাড়ছিলেন। ওঁর মুখে-চোখে একটা ভয়ের প্রলেপ ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোটকার কথা শেষ হলে চাপা গলায় একবার বললেন, 'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

ছোটকা অন্ধকারে দেওয়াল হাতড়ানোর মতো সমস্যাটা নিয়ে এলোমেলো ভাবছিল। অবিনাশ চাকলাদার আসলে যে-ই হোক, অবিনাশ-২০০২ তার হাতে গেলে সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না। আর ভাইরাল প্রোগ্রামটা নিয়ে সে যখন কাজে লাগাতে চাইছে, তার মানে ভাইরাল প্রোগ্রাম চালানোর ব্যাপারে তার ভালোই আইডিয়া আছে।

নাঃ, ঘুরে-ফিরে সেই একই জায়গায় এসে দাঁড়াতে হচ্ছে : এই ল্যাবের সঙ্গে যুক্ত পাঁচজনের একজনই অবিনাশ চাকলাদার নাম নিয়ে এই ভয়-দেখানো ফোনটা করেছে। কিন্তু লিটার বিন থেকে কাগজটা যখন সে হাতিয়ে নিতে পারল তখন ভাইরাস প্রোগ্রামটা গোপনে কপি করতে পারল না কেন!

সে-কথাই ছোটকা প্রকাশ দেবনাথকে জিগ্যেস করল।

উত্তরে ড. দেবনাথ বললেন, 'অবিনাশ-২০০২-এর পোটেনশিয়াল জানার পর আমি প্রোগ্রামটাকে সফ্‌টওয়্যার লক করে রেখেছি। তাতে কেউ চাইলেই ওটা কপি করতে পারবে না। তাকে আগে লকের কোডটা ব্রেক করতে হবে। আমার মনে হয়, অবিনাশ-২০০২-কে লুকিয়ে কপি করতে না পেরে অবিনাশ চাকলাদার হুমকির পথ বেছে নিয়েছে। ও বুঝতে পেরেছে, আমি নিজে থেকে প্রোগ্রামটা কপি

করে না দিলে ওর পাওয়ার কোনও উপায় নেই। তা ছাড়া আমার সফ্‌টওয়্যার লকের কোডটাও বেশ কঠিন। ওটা ব্রেক করা প্রায় অসম্ভব।'

'অনেক রাত হয়ে গেছে—এবার উঠি।' ছোটকা উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে : 'আপনি খুব কেয়ারফুল থাকবেন। অবিনাশ চাকলাদারের ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না। আচ্ছা, ঝামেলাকে কি কাল পাওয়া যাবে? নইলে আমার দুরন্ত ভাইপো দুটো আমাকে জ্বালাতন করে মারবে।'

ড. দেবনাথ আনমনা হয়ে কীসব ভাবছিলেন। ছোটকার কথায় হুঁশ ফিরে পেয়ে বললেন, 'ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, কালই ওকে পেয়ে যাবেন।'

প্রকাশ দেবনাথের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে একটা চুরুট ধরাল ছোটকা। এতক্ষণ চুরুট খেতে না পেরে রীতিমতো হাঁফিয়ে উঠেছিল।

গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে মোবাইল ফোন থেকে বাড়িতে একটা ফোন করে দিল ছোটকা। বউদিকে বলল, 'চিন্তা কোরো না, বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাব।'

বউদির কাছেই ছোটকা শুনল, ঝালা-পালা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন সকাল থেকেই ঝামেলার খোঁজ পড়ল।

ঝালা-পালা বায়না ধরল যে, ওরা ঝামেলাকে নিয়ে আসতে যাবে। তার ওপর কাল রাতে ড. দেবনাথের সঙ্গে ছোটকার টেলিফোনে কথাবার্তার সময়ে ওরা একটু রহস্যের গন্ধ পেয়েছিল। কী একটা আবিষ্কার জানাজানি হলে নাকি সাংঘাতিক বিপদ হবে। তাই ওরা ছোটকাকে চেপে ধরল।

দু-ভাইয়ের স্কুলে যাওয়া মাথায় উঠল। ওরা শুনতে চাইল ড. প্রকাশ দেবনাথের আবিষ্কার আর সাংঘাতিক বিপদের গল্প।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল ছোটকা। দু-ভাই হাঁ করে ছোটকার কথা গিলতে লাগল।

সব শোনার পর চন্দ্রকান্ত বলল, 'কিন্তু কম্পিউটার ভাইরাসের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, ছোটকা।'

ইন্দ্রকান্ত বলল, 'আমারও ঠিক মাথায় ঢুকল না।'

ছোটকা হেসে বলল, 'আমিও কি পুরোপুরি বুঝেছি রে! সেইজন্যেই তো কাল অনেক রাত পর্যন্ত বসে-বসে ইন্টারনেটে ভাইরাসের ওপরে পড়াশোনা করছিলাম। ১৯৪৯ সালে এর গোড়াপত্তন হয়েছিল বলতে পারিস। তখন বেশিরভাগ মানুষ জানতই না যে, বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার তৈরি করে ফেলেছেন। সেই সময় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জন ফন নয়ম্যান সহগবেষকদের নিয়ে একটি রিসার্চ পেপার লেখেন। সেটার নাম ছিল ''থিয়োরি অ্যান্ড অর্গানাইজেশন অফ কমপ্লিকেটেড অটোমেটা''। এতে নয়ম্যান যে-আসল কথাটি বলেছিলেন তা হলো, কম্পিউটার প্রোগ্রাম নিজে-নিজে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে—অনেকটা ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির মতো। তখনও কম্পিউটার-ভাইরাস নামটা চালু হয়নি। এই নামটা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন আমেরিকার লেই ইউনিভার্সিটির একজন গবেষক ফ্রেড কোহেন। ১৯৮৪ সালে কম্পিউটার সিকিওরিটি নিয়ে আমেরিকায় এক বিজ্ঞানী সম্মেলন হয়। সেখানে একটা গবেষণাপত্র ফ্রেড কোহেন পেশ করেছিলেন। তাতেই প্রথম তিনি ''কম্পিউটার-ভাইরাস'' কথাটি ব্যবহার করেন। ড. কোহেনের মতে কম্পিউটার-ভাইরাস হলো এমন একটি প্রোগ্রাম যা অন্যান্য প্রোগ্রামে নিজের একটি কপি ঢুকিয়ে দিয়ে সেই প্রোগ্রামগুলোকে সংক্রামিত করে।'

ছোটকা চুপ করতেই ঝালা-পালা মাথা চুলকোতে লাগল।

ছোটকা ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, 'কী হলো রে, মাথা চুলকোচ্ছিস কেন?'

ইন্দ্র বলল, 'এমনিতে ঠিকই আছে—তবে শেষটা কেমন গুলিয়ে গেল। প্রোগ্রামের মধ্যে প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে দিলেই সেটা ভাইরাস হয়ে গেল!'

চন্দ্রও সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল।

ছোটকাও মাথা চুলকে একচিলতে হাসল : 'আমিও কি এ-ব্যাপারে খুব বেশি জানি রে! দাঁড়া, একটা এক্সাম্পল্‌ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি। ধর, একটা অফিসে একজন কেরানিবাবু কাজ করেন। রোজ

অফিসে এসে তিনি দেখেন তাঁর টেবিলে সেদিনকার কাজের ফিরিস্তি জানিয়ে একতাড়া কাগজ রাখা আছে। তিনি প্রথম কাগজটা তুলে নিয়ে ওপরওয়ালার লেখা নির্দেশগুলো পড়লেন। সেইমতো সব কাজ শেষ করলেন। তারপর নির্দেশ লেখা প্রথম কাগজটা লিটার বিনে ছুড়ে ফেলে দিলেন। এরপর আমাদের কেরানিবাবু তুলে নিলেন দ্বিতীয় কাগজটা। তাতে লেখা নির্দেশগুলো পড়ে নিয়ে আবার কাজ শুরু করলেন।

'এখন ধরা যাক, সেই অফিসে একটা বদমাশ লোক লুকিয়ে ঢুকে পড়ল। সে কেরানিবাবুর কাগজের তাড়ার মধ্যে একটা বাড়তি কাগজ গুঁজে দিল। সেই কাগজটায় নির্দেশ দেওয়া আছে : এই কাগজটা দুবার কপি করে তোমার পাশের দুজন কেরানির টেবিলে কাগজের তাড়ার মধ্যে গুঁজে দাও। তখন কেরানিবাবু কী করবেন? বদমাশ লোকটার কাগজটা পেয়ে সেটাকে ওপরওয়ালার নির্দেশ বলে ভাববেন এবং তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে মূল কাগজটা লিটার বিনে ছুড়ে ফেলে দেবেন। তারপর নিয়মমাফিক টেবিল থেকে পরের কাগজটা তুলে নিয়ে আবার কাজে মন দেবেন।

'যে-দুজন নতুন কেরানি কাগজটা পেলেন তাঁরা কী করবেন? তাঁরাও নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে বদমাশ লোকটার নির্দেশকে ওপরওয়ালার নির্দেশ ভেবে তার দুটো কপি করে আরও দুজন কর্মীর টেবিলে দিয়ে দেবেন। এর ফলে নির্দেশটা মোট চার কপি হয়ে গেল। এইভাবে প্রতিদিন কাগজটা কপি হয়ে-হয়ে অন্যান্য কর্মীদের টেবিলে পৌঁছে যাবে এবং একই সঙ্গে বদমাশ লোকটার নির্দেশের কপির সংখ্যা লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়তে থাকবে। ফলে কয়েকদিন পরেই দেখা যাবে ওই অফিসের সব কর্মী অন্য সব জরুরি কাজ ছেড়ে শুধু ওই নির্দেশটাকেই কপি করে চলেছে।'

থেমে একটু দম নিল ছেটকা। তারপর বলল, 'কম্পিউটার ভাইরাস ঠিক এভাবেই কাজ করে। ধরে নে, আমাদের কেরানিবাবু হলো কম্পিউটার, আর তাঁর টেবিলে রাখা কাগজের তাড়া হলো কম্পিউটার প্রোগ্রাম। আর বদমাশ লোকটার নির্দেশ লেখা কাগজটা হলো ভাইরাল প্রোগ্রাম। ভাইরাস ইনফেক্টেড কম্পিউটারে ইনফেক্টেড প্রোগ্রামটা চালালেই তাতে লুকিয়ে থাকা ভাইরাল প্রোগ্রাম অন্যান্য প্রোগ্রামে কপি হয়ে ঢুকে পড়ে। তারপর একসময় কম্পিউটারের মেমোরি ভরতি হয়ে গিয়ে সবকিছুর বারোটা বেজে যায়।'

ঝালা-পালা চোখ বড়-বড় করে বলল, 'বাব্বাঃ, ভাইরাস মানে এতসব সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

'হ্যাঁ। তা হলেই বোঝ, ঝামেলা বেচারির কী কষ্ট হচ্ছে!'

দাদা-বউদিকে বলে আগে ম্যানেজ করল ছেটকা। তারপর ঝালা-পালাকে নিয়ে সময়মতো বেরিয়ে পড়ল।

গাড়িতে ওঠার আগে ড. দেবনাথকে ফোন করে জানতে পারল, অবিনাশ চাকলাদার সকাল আটটা নাগাদ একবার ফোন করেছিল। একই ধরনের হুমকি দিয়ে সে ভাইরাসের কপি চেয়েছে। ওটা না পেলে সে প্রকাশ দেবনাথকে কিডন্যাপ করে খুন করবে।

ফোন ছেড়ে দেওয়ার আগে ড. দেবনাথ একটা অদ্ভুত কথা বললেন।

'...আমাকে থ্রেট করার সময় অবিনাশ চাকলাদার হঠাৎ হাঁচতে শুরু করে। বোধহয় ঠাণ্ডা লেগে থাকবে। কিন্তু তারপরই যখন সে আবার কথা বলতে শুরু করে তখন তার গলাটা কেমন যেন চেনা মনে হয়। তবে কোথায় এরকম গলা শুনেছি সেটা আমি ঠিক প্লেস করতে পারিনি।'

ছেটকা বলল, 'হাঁচির ঠিক পরে-পরেই হয়তো গলাটা চেঞ্জ করে উঠতে পারেনি। আর শুনুন, আমরা এখুনি আপনার বাড়ি রওনা হচ্ছি।'

ছেটকার মারুতি ছুটতে শুরু করল।

চার

প্রকাশ দেবনাথের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই একটা হট্টগোল কানে এল।

ছেটকা আর ঝালা-পালা ড. দেবনাথের সদর দরজায় হাজির হওয়া... দরজা খুলে গেল। ঝামেলা বেরিয়ে এল বাইরে। ওর গোল মাথায় বসানো লাল-নীল-হলদে-সবুজ বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলছে-নিভছে। আর ও উত্তেজিতভাবে তিড়িংবিড়িং করে লাফিয়ে 'ফুজিয়ামা! ফুজিয়ামা!' বলে চেঁচাচ্ছে।

ঝামেলা খুব খুশি হলে বা উত্তেজিত হলে এরকম করে। তবে তখন ও কেন যে জাপানের বিখ্যাত আগ্নেয়গিরির নাম ধরে চেঁচায় তা কেউ জানে না।

ঝালা-পালা একসঙ্গে জানতে চাইল, 'ঝামেলা, কী হয়েছে?'

ঠিক তখনই ঝামেলার পিছনে রোবিদাসকে দেখা গেল। আর রোবিদাসের পিছনে বছর তিরিশের এক ফরসা রোগা যুবক। যুবকের চোখে রিমলেস চশমা, থুতনিতে নুর, পরনে সবুজ টি-শার্ট আর কটন ক্যাসুয়াল।

ওদের দুজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে ঝামেলা বলল, 'এরা আমাকে কিডন্যাপ করে এখানে আটকাইয়া রাখিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া গর্দান মটকাইবে।'

ঝামেলাকে শান্ত করার জন্য ছেটকা তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না—তুমি ভুল করছ। তোমার অসুখ করেছিল বলে এখানে সারাতে দিয়ে গিয়েছিলাম।'

ঝামেলা বিরক্তভাবে বলল, 'এরা আবার ডাক্তার নাকি? সব হাতুড়ি ডাক্তার। এই বাড়িটাই হাতুড়ি-নিবাস।'

ছেটকা বুঝল, ঝামেলা 'হাতুড়ে' বলতে গিয়ে 'হাতুড়ি' বলছে। নাঃ, বাচ্চা-রোবটটা মহা খেপে গেছে দেখছি!

ঝালা-পালা বহু কষ্টে নেড়া মাথায় হাত বুলিয়ে ঝামেলাকে শান্ত করল।

রোবিদাস সব দেখে-শুনে কোমর নাচিয়ে বলল, 'ট—ং! এরকম বাঁদুরে আদুরে রোবট কখনও দেখিনি। কী ইম্পেশেন্ট পে-পে-পেশেন্ট রে বাবা!'

ঝামেলা উত্তরে রোবিদাসকে জামি দেখাল। বলল, 'তোতলা ডিফেক্টিভ মেশিন। সাহস থাকে বল তো, পাক্কি পিঠে পাকা পেঁপে...!'

রোবিদাস বারদুয়েক 'পা-পা—' বলে লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল।

ঝামেলা হাততালি দিয়ে নেচে উঠল।

ছোটকা গাড়ির রিমোট ইউনিটটা ঝালা-পালাকে দিয়ে বলল, 'ঝামেলাকে নিয়ে তোরা গাড়িতে গিয়ে বোস—কোথাও যাবি না। আমি একটু পরে এসে তোদের ল্যাব-টারগুলো ঘুরিয়ে দেখাব।'

ঝালা-পালা ঝামেলাকে নিয়ে গাড়ির দিকে চলে যেতেই অচেনা যুবকটি প্রথম কথা বলল, 'আপনাদের রোবটটা ভারি ইন্টারেস্টিং তো!'

ছোটকা হেসে বলল, 'আসলে আমি ওটা তৈরি করেছি। আমার রোবোটিক্স-এ ফর্মাল নলেজ নেই বলে ওটা ওরকম উলটোপালটা লজিকে কাজ করে...।' একটু থেমে ছোটকা জিগ্যেস করল, 'আপনি কি ড. দেবনাথের ল্যাবে রিসার্চ করেন?'

যুবক মাথা নাড়ল : 'হ্যাঁ—আমার নাম প্রভাস—প্রভাস দত্ত। এখানকার সিনিয়ার রিসার্চ স্কলার।'

'আমার নাম প্রসেনজিৎ রায়—ড. দেবনাথের বন্ধু। উনি ল্যাবে আছেন তো?'

'হ্যাঁ, আছেন। আসুন, ভেতরে আসুন।'

ল্যাবের দিকে যেতে-যেতে প্রভাস বলল, 'আমি রোবট কমিউনিকেশন নিয়ে গবেষণা করছি। সেইজন্যেই দুটো রোবটের ঝগড়া মন দিয়ে শুনছিলাম।'

ছোটকা হেসে বলল, 'রোবটদের কথাবার্তা বা ঝগড়া সবই খুব ইন্টারেস্টিং।'

প্রভাসের রোগাটে মুখে চশমার কাচদুটো ভীষণ বড় লাগছিল। তার ওপর ছোটকা লক্ষ করল, প্রভাস মাঝে-মাঝেই মাথাটা ডানদিকে সামান্য নাড়াচ্ছে—অনেকটা ঢেঁকি তোলার মতো।

ল্যাবে ঢুকতেই ড. দেবনাথের সঙ্গে দেখা।

রোবিদাস তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তখন ঝামেলার নামে অভিযোগ করছে : '...জানেন স্যার, বদমাশ রোবটটা আমাকে শাস্তি দেখিয়েছে। তারপর বলেছে, পা-পা-পাখির...আর বলতে পা-পারছি না। আপনি যেভাবেই হোক আমার তোতলামিটা সারিয়ে দিন। ওই বেঁটে নেড়া রোবটটার কাছে আমি হেরে গেলাম।'

ড. দেবনাথ কিছু বলার আগেই প্রভাস বলল, 'তোমার কোনও চিন্তা নেই, রোবিদাস, ওটা আমি ঠিক করে দেব। তুমি আমার সঙ্গে এসো—।'

রোবিদাসকে নিয়ে প্রভাস ল্যাবের এক কোণে চলে গেল।

ছোটকা প্রকাশ দেবনাথকে বলল, 'ঝামেলাকে ঠিকঠাক করে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। ও রোবিদাসের সঙ্গে যেরকম ঝগড়া বাধাল তাতেই বুঝেছি ও সেরে উঠেছে। ওর কাজই হলো যত রাজ্যের ঝামেলা পাকানো। ওকে ভাইপোদের সঙ্গে গাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখানে মনের আনন্দে মেতে থাকবে। এবারে বলুন, এদিকে কী খবর...।'

ড. দেবনাথ বললেন, 'একটা ব্যাপার হয়েছে, মিস্টার রায়। আজ সকালে কাজ শুরু করার পর আমার দুজন স্কলার—প্রভাস দত্ত আর মিত্যুন রায়চৌধুরি—ওরা রিপোর্ট করল যে, ওদের কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কের অনেক ফাইল ডিলিট হয়ে গেছে...মানে, কেউ মুছে দিয়েছে।'

'হঠাৎ এভাবে কেউ ফাইল মুছতে যাবে কেন?'

'তা জানি না। তবে কম্পিউটারগুলো নিয়ে কেউ যে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে তাতে ভুল নেই।'

ড. দেবনাথকে ল্যাবের একপাশে ডেকে নিয়ে গেল ছোটকা। চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'প্রভাসের সঙ্গে তো আলাপ হলো। বাকি চারজন কি এসেছেন?'

'হ্যাঁ—অ্যান্টিচেম্বারে মিত্যুনকে নিয়ে টেকনিকাল আলোচনায় বসেছেন। মিটিং-এর ছুতো করে ওঁদের ডেকে এনেছি। চলুন, আপনাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিই।'

'না, ড. দেবনাথ, এরকম আচমকা আলাপ করালে ওঁরা সন্দেহ করবেন। বিশেষ করে অবিনাশ চাকলাদারের ব্যাপারটা আপনি যখন কাউকে বলেননি...।'

প্রকাশ দেবনাথ দাড়িতে হাত বুলিয়ে ঘাড় নাড়লেন : 'ঠিক বলেছেন। তা হলে?'

তা হলে কী সেটাই বলতে যাচ্ছিল ছোটকা, কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘরে যেন প্রকাণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

মিউজিক সিস্টেমের মিউজিক আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। তার বদলে কারও কথা শোনা গেল।

কথা শুরু হওয়ামাত্রই ড. দেবনাথ ভয়ে সাদা হয়ে গেলেন।

কারণ তিনি অবিনাশ চাকলাদারের গলা চিনতে পেরেছেন।

অবিনাশ চাকলাদার তখন বেশ স্পষ্ট গলায় বলছে, 'ড. প্রকাশ দেবনাথ, অবিনাশ চাকলাদার বলছি। দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্নিং। আপনার নতুন আবিষ্কারটি আমার চাই—কম্পিউটার ভাইরাস অবিনাশ-২০০২। ওটা কালকের মধ্যে না পেলে ভারত একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে হারাবে। আমার কিছু করার নেই। আর হ্যাঁ, ভাইরাল প্রোগ্রামটা দেওয়ার আগে সফ্‌টওয়্যার লকটা খুলে দেবেন। মনে থাকে যেন, ডেডলাইন হলো কাল রাত বারোটা। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্যে ধন্যবাদ।'

অবিনাশ চাকলাদারের কথা শেষ হতেই আবার আনন্দের বাজনা বাজতে শুরু করল।

ঘরের সবাই চুপ।

প্রভাস দত্ত নিজের সিট ছেড়ে চলে এল প্রকাশ দেবনাথের কাছে। ওর পিছন-পিছন রোবিদাস।

নাকের ডগায় চশমা ঠিক করে বসাল প্রভাস। মাথাটা দুবার নেড়ে বলল, 'স্যার, এসব কী ব্যাপার!'

ঠিক তখনই অ্যান্টিচেম্বার থেকে চারজন মানুষ ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢুকে পড়ল ল্যাবের ভেতরে।

প্রথমজন বেশ মোটাসোটা চেহারার, গায়ের রং ময়লা, মাথায় অকালে টাক পড়েছে। সে হাত-মুখ নেড়ে অবাক হয়ে বলল, 'মিউজিক সিস্টেমে হঠাৎ এ কী শুনলাম, স্যার? কে এই অবিনাশ চাকলাদার? অবিনাশ-২০০২ ভাইরাসের

ব্যাপারটাই বা কী?'

প্রকাশ দেবনাথ হঠাৎই যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ শান্ত হয়ে গেলেন। তারপর জবাব দিলেন, 'শোনো, মিত্থান, উত্তেজিত হয়ে কোনও লাভ নেই। বড় জোর দেশের স্বার্থে আমাকে মরতে হবে। তোমাদের কাউকে এতদিন বলিনি—আজ বলছি। দিন সাত-আট আগে একটা নতুন কম্পিউটার-ভাইরাস আমি তৈরি করেছি। কোনও অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ওটাকে ডিফাক্ট করতে পারে না। তাই আমি ওটার নাম দিই অবিনাশ-২০০২। তারপর...।'

সংক্ষেপে সব ঘটনা বললেন প্রকাশ দেবনাথ। দুজন স্কলার ও তিনজন বিজ্ঞানী স্তম্ভিত হয়ে তাঁর কথা শুনলেন। তারপর ওঁদের নিজেদের মধ্যে নানান কথার ফুলঝুরি শুরু হলো। শান্ত ল্যাবটা হঠাৎই যেন অশান্ত হয়ে উঠল।

ড. দেবনাথ হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে অনুরোধ করলেন। তারপর বললেন, 'আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই—যদি কোনও বিপদ হয় আমার হবে, আর কারও নয়। গতকাল থেকে অবিনাশ চাকলাদারের হুমকির ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। সেইজন্যেই আমি মিস্টার প্রসেনজিৎ রায়কে খবর দিয়েছি। উনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই বিপদে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।' ছোটকার দিকে হাত দিয়ে দেখালেন প্রকাশ দেবনাথ : 'মিস্টার রায় ইলেকট্রনিক্সে এক্সপার্ট, তবে রোবোটিক্সেও সামান্য কিছু কাজ করেছেন। সেই সূত্রেই আমার সঙ্গে পরিচয়...।'

ছোটকা লক্ষ করল, প্রকাশ দেবনাথ তার আসল পরিচয়টা গোপন রাখলেন।

সেটা আরও স্পষ্ট হলো যখন তিনি ছোটকার কাছে এগিয়ে এসে বাঁ চোখ ছোট করে একটা দুষ্টু ইশারা করলেন, তারপর বললেন, 'আসুন, প্রসেনজিৎবাবু, আপনার সঙ্গে এঁদের পরিচয় করিয়ে দিই...।'

পরিচয় হলো।

প্রভাস দত্ত আর মিত্থান রায়চৌধুরি রিসার্চ স্কলার।

আর বিজ্ঞানী তিনজন হলেন ড. ওয়াসিম খান, ড. কল্যাণ সেনবর্মা, আর ড. অশোক মিশ্র।

পরিচয়ের পালা শেষ হতেই শুরু হলো ঝামেলা। ড. মিশ্র বেশ ব্যঙ্গভাবেই ড. দেবনাথকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি ইম্মরটাল, ইয়নি কি অমর, ভাইরাস ডিসকভার করেছেন ফির ভি আমাদের বলেননি। কেন জানতে পারি?'

'ব্যাপারটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।' প্রকাশ দেবনাথ হাত নেড়ে বোঝাতে চাইলেন : 'আমি ল্যাবে বসে কাজ করছিলাম, সাডেন্‌লি অবিনাশ-২০০২ তৈরি হয়ে গেল। তারপর...।'

মিশ্র বিরক্তভাবে হাত নাড়লেন : 'কম্পিউটার-ভাইরাস কখনও সাডেন্‌লি তৈরি হয় না। ভাইরাল প্রোগ্রামকে অনেক মেহনত করে বানাতে হয়। তা ছাড়া পরদিন তো আপনি আমাদের বলতে পারতেন! আমরাও তো নয়া-নয়া আইডিয়া পেলে আপনাকে বলি, নিজেরা আপসমে ডিসকাস করি। উই ওয়ার্ক অ্যাজ আ টিম, ম্যান!'

'জানি। তবে ভাইরাসটার পোটেন-শিয়াল দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। যদি এটা কোনও খারাপ লোকের হাতে পড়ে, তা হলে...।'

'আমরা খারাপ লোক! বুরা আদমি!' রাগে মুখিয়ে উঠলেন ড. মিশ্র : 'তো এখন যে ডেঞ্জার হলো তার জন্যে কে দায়ী? কওন হ্যায় ইসকে জিম্মেদার?'

প্রকাশ দেবনাথ চুপ করে রইলেন। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না।

ছোটকা অশোক মিশ্রকে দেখছিল। গোলগাল ফরসা মুখ এখন লালচে। ঠোঁট দেখে মনে হয় পান খাওয়ার অভ্যেস আছে। বয়েস পঞ্চাশ কিংবা তার কাছাকাছি। গায়ে লাল-হলুদে মাখামাখি রংচঙে শার্ট। লোমশ কবজিতে সোনালি ঘড়ি ঝকমক করছে।

অশোক মিশ্র সবার মুখের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ড. দেবনাথের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে শক্ত গলায় বললেন, 'আপ হ্যায় জিম্মেদার, ড. দেবনাথ, সিরফ আপ! তাই এ-ব্যাপারে আপনি আমাকে জড়াবেন না। আই অ্যাম দ্য লাস্ট পারসন...আমি এখুনি লালবাজারে ইনফর্ম করছি।'

কথা বলতে-বলতে ড. মিশ্র ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ছোটকা হঠাৎ বাধা দিল।

'এক মিনিট, ড. মিশ্র। যাওয়ার আগে একটা কথা বলি। দয়া করে পুলিশে কোনও খবর দেবেন না। কারণ, আপনার জেনে রাখা দরকার : এই অবিনাশ চাকলাদার লোকটি আমাদের অচেনা নয়। সে এখন এই ঘরের মধ্যেই আছে।'

'তার মানে!'

'মানে খুব সিম্প্‌ল। আপনাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন হলো অবিনাশ চাকলাদার। নামটা তার অবশ্যই নকল—এমনকী গলার স্বরটাও। নইলে সে এতক্ষণে ধরা পড়ে যেত। সেইজন্যেই বলছি পুলিশে খবর দেবেন না—তাতে আপনারাই হ্যারাসড্‌ হবেন।'

ড. মিশ্রের সব সাহস ফুস করে উড়ে গেল। চোখের পলকে মুখে একটা কাচুমাচু ভাব ছড়িয়ে পড়ল। ছোটকার খুব কাছে এসে চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'হায় রাম! এ কী বলছেন আপনি! আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন! বিশওয়াস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

ছোটকা হেসে বলল, 'আপনি সায়েন্টিস্ট মানুষ—বিশ্বাস নয়, যুক্তি দিয়ে ভাবুন।'

অশোক মিশ্র বাকি চারজনের মুখের ওপর খুব ধীরে-ধীরে চোখ বোলালেন। এদের মধ্যে কে? কে?

ড. ওয়াসিম খান এবার প্রকাশ দেবনাথের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

সুপুরুষ দীর্ঘ চেহারা। পরনে সাদা জামা, সাদা প্যান্ট। জামার হাতায় বিদেশি কাফলিঙ্ক। গা থেকে সুন্দর পারফিউমের হালকা গন্ধ বেরোচ্ছে। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। মাথার ঝাঁকড়া চুলে বোধহয় কলপ দেওয়া।

'ড. দেবনাথ, মিস্টার রায়ের কথা তো বুঝলাম। কিন্তু আমি ভাবছি, মিউজিক সিস্টেমের মধ্যে অবিনাশ চাকলা না কী যেন বললেন—তার ভয়েসের অডিও সিডিটা কে ঢোকাল। মিউজিক সিস্টেমের

সিডিগুলো কে চেঞ্জ করে?'

ড. দেবনাথ দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'জেনারালি রোবিদাস চেঞ্জ করে, তবে ইচ্ছে করলে যে-কেউ করতে পারে। ওই তো, ওই প্যানেলের পিছনে মিউজিক সিস্টেমটা রাখা আছে।' কথা বলতে-বলতে আঙুল তুলে ল্যাবের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে একটা সাদা চৌকো প্যানেল দেখালেন প্রকাশ দেবনাথ : 'ওটার পাশে অনেকগুলো সিডিও রাখা আছে। আপনারা তো সবাই জানেন! এই তো গত পরশু প্রভাস আমাদের সবার সামনেই সিডি চেঞ্জ করল।'

ড. মিশ্র তখন ড. কল্যাণ সেনবর্মার সঙ্গে চাপা গলায় উত্তেজিতভাবে কিছু একটা আলোচনা করছিলেন। বারবার সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

ওয়াসিম খান রোবিদাসকে কাছে ডাকলেন, 'রোবিদাস, মিউজিক সিস্টেম থেকে সিডিটা বের করে নাও তো! তারপর ড. দেবনাথকে দেখাও...।'

রোবিদাস অক্ষরে-অক্ষরে আদেশ পালন করল। প্যানেল সরিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে এবং অভ্যস্ত হাতে একটা সিডি বের করে নিল।

সিডিটা ড. দেবনাথের হাতে দিল রোবিদাস : 'স্যার, এই নিন...।'

সিডিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন ড. দেবনাথ। এর মধ্যে অবিনাশ চাকলাদারের ভয়েস ওভারল্যাপ হলো কেমন করে? তাঁর ল্যাবে বসেই কি কেউ এই কাজটা করেছে?

তিনজন বিজ্ঞানী আর দুজন রিসার্চ স্কলার প্রকাশ দেবনাথকে ঘিরে ধরলেন। ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন প্রলয়ংকর সিডিটাকে। কী করে যন্ত্রসঙ্গীতের মধ্যে ঢুকে পড়ল অবিনাশ চাকলাদারের হুমকি?

ছোটকা বলল, 'ড. দেবনাথ, সিডিটা আপনি আলাদা করে রাখুন। আমরা পরে এর ভয়েস সিগনালটা অ্যানালিসিস করে দেখব। তারপর এই পাঁচজনের ভয়েসের সঙ্গে ম্যাচ করে দেখলেই ধরা পড়ে যাবে...।'

ছোটকাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই ফেটে পড়লেন ড. সেনবর্মা : 'দেন ডু ইট রাইট নাউ! আমরা জানতে চাই কে এরকম হুমকি দিচ্ছে। কে অবিনাশ-২০০২-কে হাতিয়ে গোটা পৃথিবীর সর্বনাশ করতে চাইছে!'

ছোটকা সেনবর্মাকে দেখল।

কালো মোটাসোটা চেহারা। ডান হাতের ফোলা-ফোলা আঙুলে তিন-তিনটে রঙিন পাথর। বিজ্ঞানী হয়েও জ্যোতিষশাস্ত্রের মায়া কাটাতে পারেননি। ঘন কালো ভুরুর নিচে ছোট-ছোট চোখ যেন গর্তে ঢুকে আছে। বাঁ গালে একটা পুরনো কাটা দাগ।

ছোটকা হাত নেড়ে কল্যাণ সেনবর্মাকে আশ্বস্ত করতে চাইল। বলল, 'প্লিজ, আপনারা উত্তেজিত হবেন না। আমরা যা স্টেপ নেওয়ার নিচ্ছি। ড. দেবনাথের সেফটির জন্যে আমরা ব্যবস্থা করছি।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা! উত্তেজিত জটলা আর কথা চালাচালি চলতেই থাকল।

মিত্থান ছোটকাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'মিস্টার রায়, ব্যাপার-স্যাপার খুব সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠেছে। সময় তো আর বেশি নেই। কিছু একটা করুন। নিজেদের মধ্যে সন্দেহের বিষ ছড়িয়ে থাকলে আমরা মন দিয়ে গবেষণা করব কেমন করে?'

প্রভাস বলল, 'আমাদের কি পুলিশে খবর দেওয়া উচিত? আপনি কী বলেন?'

ছোটকা মাথা নাড়ল : 'না, না। বললাম তো, এখনই সব জানাজানি হলে বিপদ বাড়বে।'

হঠাৎই ল্যাবের ফোন বেজে উঠল।

সব কথাবার্তা মুহূর্তে থেমে গেল। ঘরটা নিস্তব্ধ থমথমে হয়ে গেল।

ফোনটা বেজেই চলেছে, অথচ প্রকাশ দেবনাথ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

শেষ পর্যন্ত ছোটকা যখন ফোনটা ধরতে পা বাড়াল তখন প্রকাশ দেবনাথ বলে উঠলেন, 'আপনি ধরবেন না, মিস্টার রায়।' তারপর রোবিদাসকে বললেন, 'রোবিদাস, ফোনটা ধরো—।'

রোবিদাস এগিয়ে গেল ফোনের কাছে। রিসিভার তুলে কানে লাগিয়ে বলল, 'হ্যালো—।'

কিছুক্ষণ কথা শোনার পর 'এক্ষুনি বলছি' বলে রিসিভার জায়গামতো রেখে দিল। তারপর ড. দেবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আপনার বাবা দোতলা থেকে ফোন করেছেন। আপনাকে একবার ওপরে ডেকেছেন।'

এতক্ষণে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেন। ড. মিশ্র গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন। বললেন, 'আমরা সব ভরপোক হয়ে গেছি।'

ড. ওয়াসিম খান চাপা গলায় মিশ্রকে বললেন, 'কী হচ্ছে, ড. মিশ্র! এখন হাসি-ঠাট্টার সময় নয়—প্লিজ!'

অশোক মিশ্র ড. খানের দিকে তাকিয়ে কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন।

ড. দেবনাথ সবাইকে বললেন, 'এক্সকিউজ মি। আমি একটু ওপরে দেখা করে আসছি।'

ছোটকা ওঁর কাছে গিয়ে বলল, 'আমি একটু আমার ভাইপো দুটোকে ল্যাবে ডেকে নিচ্ছি। ওদের বলেছিলাম, ল্যাবটা ঘুরিয়ে দেখাব।'

ড. দেবনাথ হেসে বললেন, 'অফ কোর্স।' তারপর ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ছোটকাও বেরিয়ে এল ল্যাবের বাইরে। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ঝামেলার কোড নম্বর ডায়াল করল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝামেলার শরীরে বসানো ইনবিল্ট টেলিফোন সিস্টেম অ্যাক্টিভ হয়ে উঠল। ঝামেলার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ছোটকা এই ব্যবস্থাটা মাসখানেক হলো তৈরি করে নিয়েছে।

গাড়িতে বসে ঝামেলা যমজ দু-ভাইকে সল্ট লেক এবং বিধান রায় সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছিল, হঠাৎই ওর কানে সিগনাল বাজল। তারপরই ও ছোটকার কথা শুনতে পেল।

'ঝামেলা, তুমি ঝালা-পালাকে নিয়ে এখুনি ল্যাবে চলে এসো। ল্যাবে পাঁচজন লোক আছে—তুমি তাদের ফটো তুলে নেবে আর ভয়েস রেকর্ড করে নেবে।

পরে ভয়েস সিগনালগুলো অ্যানালিসিস করে দেখতে হবে। তোমরা ল্যাবে এমন-ভাবে ঘুরে বেড়াবে যেন ল্যাব দেখতে এসেছ। চলে এসো, কুইক।'

টেলিফোন সিস্টেম অটোমেটিক অফ হয়ে গেল।

ঝামেলা তড়িঘড়ি গাড়ি থেকে নামতে-নামতে বলল, 'চলো বৎসগণ, বসের ডাক আসিয়াছে।'

ঝালা-পালা বুঝল ছোটকা ওদের ভেতরে ডেকে পাঠিয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে ওরা রিমোট ইউনিটের বোতাম টিপে গাড়ি লক করে দিল।

ঝামেলা হেলেদুলে প্রকাশ দেবনাথের বাড়ির দিকে যেতে-যেতে মাথা নেড়ে হাততালি দিয়ে গাইতে লাগল : 'ইফ ইওর কল হিয়ার নোবডি নো কাম দেন অ্যালোন চলো রে...ইফ ইওর কল হিয়ার নোবডি...।'

সুরটা শুনে ঝালা-পালা বুঝল ঝামেলা ইংরেজি অনুবাদ করে রবিঠাকুরের গান গাইছে : 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে...।' তবে শেষের 'চলো রে'টা আর অনুবাদ করে উঠতে পারেনি।

পাঁচ

একতলা থেকে একটা শব্দ ভেসে এল—কোনও কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশ দেবনাথের তন্দ্রা কেটে গেল। নিচের ল্যাব থেকে এল না শব্দটা!

অন্ধকারে চোখ গেল খোলা জানলার দিকে। কখন যেন ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। রাস্তার ঠিকরে পড়া আলোয় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো রুপোর কুচি বলে মনে হচ্ছে।

কালরাতে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ার পর অনেক চেষ্টা করেও ঘুম আসেনি। মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে অবিনাশ-২০০২ আর অবিনাশ চাকলাদারের কথা। আর চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও নেই। তারপরই কিছু একটা কাণ্ড করবে অবিনাশ চাকলাদার। লোকটা তাঁর খুব চেনা—অথচ অচেনা।

বিছানায় উসখুস করতে-করতে একসময় তন্দ্রা এসে চোখ জড়িয়ে দিয়েছিল।

তারপর...হঠাৎই এই শব্দটা...।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। এগিয়ে গেলেন জানলার কাছে। নিচের ল্যাবের আলো জানলা দিয়ে ছিটকে পড়েছে বাগানের করবীর ঝোপে।

ক'টা বাজে এখন? প্রকাশ দেবনাথ পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন বিছানার পাশে রাখা ছোট টেবিলের কাছে। টেবিল থেকে হাতঘড়িটা তুলে নিলেন। রাত দেড়টা।

এ সময়ে ল্যাবে আলো জ্বলাটা তেমন অস্বাভাবিক নয়। রোবিদাস অনেক সময় সারা রাত কাজ করে। ও অ্যানড্রয়েড—তাই ও কখনও ক্লান্ত হয় না, ওর কখনও ঘুম পায় না।

কিন্তু শব্দটা কীসের হলো?

ড. দেবনাথ ঘড়িটা হাতে পরে নিলেন। ছোট টেবিল থেকে চশমা তুলে নিয়ে চোখে দিলেন। তারপর একটা হাফ শার্ট গায়ে দিয়ে ঘরের বাইরে চলে এলেন।

করিডরটা সামান্য আঁধারি হলেও তাঁর কোনও অসুবিধে হলো না। অভ্যস্ত পায়ে সিঁড়ি নামতে শুরু করলেন।

ল্যাবের দিক থেকে আরও একটা শব্দ ভেসে এল।

রোবিদাস ল্যাবে অনেক কাজ করে বটে তবে এতই গোছালো যে, তেমন একটা শব্দ-টব্দ হয় না।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ল্যাবের কাছে চলে এলেন প্রকাশ দেবনাথ। কাচের দরজা দিয়ে ল্যাবের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। তবে রোবিদাসকে চোখে পড়ছে না। নিশ্চয়ই সফটওয়্যার রুমে আছে।

ল্যাবে ঢোকার জন্য কাচের দরজা ঠেলে পা বাড়ালেন ড. দেবনাথ।

সঙ্গে-সঙ্গে ল্যাবের আলো নিভে গেল।

আচমকা লোডশেডিং হলো নাকি?

না, তা তো নয়! কারণ, দূরে এককোণে একটা কম্পিউটার 'অন' হয়ে রয়েছে।

'রোবিদাস! রোবিদাস!' চাপা গলায় ডাকলেন ড. দেবনাথ। তিনি চান না যে, চেঁচামেচিতে দোতলায় বাবা-মায়ের ঘুম ভেঙে যাক। ওঁদের ঘুম খুব পাতলা।

আবছা অন্ধকারে ল্যাবের ভেতরে কয়েক পা এগোতেই ঘাড়ের কাছে শক্ত কিছু একটা চেপে ধরল কেউ। শক্ত আর ঠান্ডা। তারপর হিসহিস করে বলল, 'এটা রিভলবারের সাইলেন্সারের নল। ট্রিগার টিপলে শব্দ বেশি হবে না তবে কাজ হবে। একটুও নড়াচড়া করবেন না।'

'রোবিদাস কোথায়?' কয়েকবার ঢোক গিলে কোনওরকমে জানতে চাইলেন ড. দেবনাথ।

'রোবিদাস অ্যান্টিচেম্বারে—ওর সুইচ "অফ" করা আছে। এখন যা বলছি শুনুন...।'

অদৃশ্য লোকটা এমনভাবে কথা বলছিল যেন ফিসফিস করে মন্ত্র পড়ছে। আর মন্ত্র পড়ে কাউকে নেশা ধরিয়ে দিতে চাইছে।

ফিসফিস করে কথা বলার জন্য লোকটার গলার স্বর চেনা যাচ্ছিল না।

ড. দেবনাথ শরীরটাকে শক্ত কাঠের মতো করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর বুকের ভেতরে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। এক্ষুনি যেন হৃদপিণ্ডটা ভেঙেচুরে চৌচির হয়ে যাবে। একইসঙ্গে একটা শ্বাসকষ্টও টের পাচ্ছিলেন তিনি।

'ড. দেবনাথ...।' অন্ধকারে কানের পাশে ফিসফিস করে কথা শুরু হলো : 'অনেক চেষ্টা করেও আপনার সফটওয়্যার লকটা আমি খুলতে পারলাম না। সেজন্যে ধন্যবাদ জানাই। য়ু আর আ গ্রেট কম্পিউটার উইজার্ড!'

লোকটা কেন ফিসফিস করে কথা বলছে? কেন লোকটা স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে না? তা হলেই প্রকাশ দেবনাথ পেয়ে যেতেন অবিনাশ চাকলাদারের আসল পরিচয়।

কার গলা এটা? ড. ওয়াসিম খান? কল্যাণ সেনবর্মা, নাকি অশোক মিত্র? আবার প্রভাস কিংবা মিঠুনেরও হতে পারে। তবে যে-ই হোক, সে ল্যাবে ঢুকে

ষ্ট করে।

ড. দেবনাথের মনের মধ্যে প্রশ্নগুলো তীব্রভাবে ছটফট করছিল। ভয় তো পাচ্ছিলেনই, তবে তার সঙ্গে বেড়ে উঠছিল কৌতূহল।

'...অবিনাশ-২০০২-এর একটা আন-লকড কপি আপনি একটা সিডিতে তুলে রাখবেন। এতে কোনও অসুবিধে হবে না—কারণ, আপনার কাছে সিডি রাইটার আছে আমি জানি। সিডির বাক্সের ওপরে একটা লেবেল সেঁটে দেবেন। তাতে লেখা থাকবে : প্রকাশ দেবনাথ-২০০২। এই লেবেল দেখেই আমি বুঝে নেব। সিডিটা ল্যাবে ঢুকে ডানদিকের সেকেন্ড টেবিলটার ওপরে ফেলে রাখবেন। কাল বিকেল পাঁচটার পর থেকে সিডিটা যেন সেই জায়গামতো রাখা থাকে। আমি সময়মতো ল্যাবে ঢুকে ওটা তুলে নেব। অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু আনলক দ্য ভাইরাল প্রোগ্রাম। যদি ওটা আনলক করতে ভুলে যান, তা হলে তার জন্যে অনেক বেশি দাম দিতে হবে। ও. কে.?'

কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে সাইলেন্সারের নল দিয়ে জোরালো খোঁচা দিল লোকটা।

'কে আপনি? ড. খান?' লোকটার পরিচয় জানতে চেয়ে খানিকটা আন্দাজেই ঢিল ছুড়তে চাইলেন প্রকাশ দেবনাথ।

উত্তরে চাপা ফিসফিসে হাসি শোনা গেল মাথার পিছন থেকে। তারপর : 'আমার নাম তো আপনি জানেন! অবিনাশ চাকলাদার...। মনে থাকে যেন...কাল বিকেল পাঁচটার পর। আর এই কথাটা কাউকে জানাবেন না। জানালে...' হিসহিস করে চাপা হাসি : 'জানেন তো কী হবে...আপনার ডেটা ফাইলটা দুনিয়া থেকে ডিলিট হয়ে যাবে—আর ফিরে পাওয়া যাবে না।'

কথার শেষে জিভে আক্ষেপের 'চুক-চুক' শব্দ করল লোকটা। তারপর সাইলেন্সারের নলটা সরে গেল ড. প্রকাশ দেবনাথের ঘাড় থেকে।

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। খুব ভালো করে নজর চালিয়েও তেমন কিছু



ঠাহর করতে পারলেন না। শুধু মনে হলো, অন্ধকারের মধ্যে আরও একটা গাঢ় অন্ধকার যেন পিছলে পালিয়ে গেল।

'রোবিদাস! রোবিদাস!' চাপা চিৎকারে ডেকে উঠলেন প্রকাশ দেবনাথ।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

তখন অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে এগিয়ে গেলেন সফ্টওয়্যার রুমের দিকে। ওই ঘরের দরজার পাশেই রয়েছে আলোর এম. সি. বি. সুইচগুলো।

দেওয়াল হাতড়ে খুঁজে পেলেন গ্যাঙ্ড সুইচের ছোট্ট হাতলটা। কেউ ওটা টেনে নিচে নামিয়ে আলোগুলো অফ করে দিয়েছে।

হাতলটা ওপরে তুলতেই ল্যাবের আলো জ্বলে উঠল। সফ্টওয়্যার রুমেও জ্বলে উঠল চারটে টিউবলাইট।

তখনই দেখলেন, একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে আছে রোবিদাস। ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ঘাড়ের নিচে হাত দিলেন ড. দেবনাথ। ওর অ্যাক্টিভিটি সুইচটা কেউ অফ করে দিয়েছে।

সুইচটা অন করে দিতেই রোবিদাস নড়েচড়ে উঠল। ড. দেবনাথকে দেখতে পেয়েই তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়াল, বলল, 'সরি, স্যার, আমি বোধহয় একটু ঘুমিয়ে প-প-পড়েছিলাম। এখুনি গিয়ে আপনার ডেটা প্-প্-প্রিন্টআউটগুলো নিয়ে নিচ্ছি।'

প্রকাশ দেবনাথ বুঝতে পারলেন অবিনাশ চাকলাদার এসে রোবিদাসকে জড়ভরত করে দেওয়ার আগে ও কতকগুলো ডেটার প্রিন্ট নিচ্ছিল। কিন্তু রোবিদাস কি দেখেছে, কে ল্যাবে এসে ঢুকেছে?

সে-কথাই জিগ্যেস করলেন রোবি-দাসকে।

উত্তরে রোবিদাস জানাল যে, না, কাউকে দেখতে পায়নি। ও সফ্টওয়্যার রুমে একটু ঢুকেছিল একটা ফ্লপি নিতে। তখনই হঠাৎ আলো নিভে যায়। আর তারপরই ও 'জ্ঞান' হারিয়ে ফ্যালে।

প্রকাশ দেবনাথ রোবিদাসের কথায় কেমন যেন ধন্দে পড়ে গেলেন। ওকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কোনও কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শোনোনি?'

'না, স্যার—ঠিক শুনতে পা-পা-পাইনি। আসলে একমনে কাজ করছিলাম তো...।'

রোবিদাসকে ওর কাজ করতে বলে ল্যাব ছেড়ে চলে এলেন ড. দেবনাথ। ওঁর কপালে ভাঁজ পড়ল, গালে আঙুল বোলালেন বেশ কয়েকবার।

লোকটা কী করে ল্যাবে ঢুকল? কারণ, রাত দশটার পর বাড়িতে ঢোকার ইলেকট্রনিক আইডেন্টিফিকেশান সিস্টেমটা অফ করা থাকে। তার বদলে কম্পিউ-টারাইজড্ অটোলক অন করে দেওয়া হয়।

তা হলে কি লোকটা বিজ্ঞানে এতই দক্ষ যে, ড. দেবনাথের সুরক্ষা পদ্ধতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিতে পেরেছে।

দোতলায় ঘরে এসে বিছানায় বসে পড়লেন প্রকাশ দেবনাথ। অন্ধকারেই তাকিয়ে রইলেন খোলা জানলার দিকে। অবিনাশ-২০০২-এর কথা ভাবতে লাগলেন।

এই ভাইরাসটা আবিষ্কার করে তিনি মনে-মনে চেয়েছিলেন দেশের কাজে লাগাতে। এই ভাইরাসটার ক্ষমতা পরমাণু বোমার চেয়েও বেশি। এই অবিনাশী

ভাইরাসের ভয় দেখিয়ে যে-কোনও শক্ররাষ্ট্রকে অনায়াসে দমিয়ে দেওয়া যেত। অবিনাশ-২০০২-এর সর্বনাশের ক্ষমতা জানার পর কোনও শক্ররাষ্ট্রই ভারতকে আর পরমাণু অস্ত্রের ভয় দেখাতে না। অথচ...।

অবিনাশ চাকলাদার কি অবিনাশ-২০০২-কে শক্ররাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করে দেবে? নাকি এই ভাইরাসের ভয় দেখিয়ে নিজের দেশকেই ব্ল্যাকমেল করবে?

কিন্তু লোকটা কাল সিডিটা নিতে আসবে কোন সাহসে! কেউ তো তাকে দেখে ফেলতে পারে। কেউ তাকে বাধা দিতে পারে।

আজ, এখন, সে ওটা লক খুলিয়ে কপি করে নেওয়ার চেষ্টা করল না কেন? পাছে প্রকাশ দেবনাথ তাকে চিনে ফেলেন তাই? কিন্তু কালও তো কেউ চিনে ফেলতে পারে। নাকি লোকটা নিশ্চিত যে, কাল ও নির্বিঘ্নে ভাইরাসের সিডিটা নিয়ে যেতে পারবে?

না, কক্ষণও না! ড. দেবনাথ কাল নিজে ল্যাবে হাজির থেকে লোকটাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তাতে প্রাণ যায় যাক!

প্রকাশ দেবনাথের ভীষণ রাগ হচ্ছিল লোকটার ওপরে। জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে-দেখতে লোকটাকে জব্দ করার কথা ভাবছিলেন। কাল সকালেই ওই হুমকি-দেওয়া সিডির ভয়েস সিগনালটা অ্যানালিসিস করতে হবে। আর ওঁর ল্যাবের সঙ্গে যে-পাঁচজন গবেষণায় জড়িয়ে আছে তাদের গলা তো টেপ করা আছেই! গতকাল ঝামেলা ওদের ভয়েস রেকর্ড করে নিয়েছে। সেটা প্রসেনজিৎ রায় ড. দেবনাথকে জানিয়েও দিয়েছে।

নাঃ, আজ রাতের ব্যাপারটা প্রসেনজিৎ-বাবুকে জানাতেই হবে। ভাবলেন ড. দেবনাথ। ভয় তাঁর নিজের জন্য নয়—দেশের জন্য। দেশদ্রোহীকে কখনও ক্ষমা করা যায় না।

চশমা আর জামা ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন ড. দেবনাথ। পাশ ফিরে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রুপোর কুচি তখনও মেঘলা আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে।

ছয়

একটা গাঢ় বাদামী রঙের টাটা সুমোর ভেতরে বসে ছিল ছোটকা, ঝালা-পালা আর ঝামেলা। গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে বছর পঁচিশের এক শক্তপোক্ত যুবক। নাম তিওয়ারি। গাড়িটা ছোটকা আজকের অপারেশনের জন্য ভাড়া করেছে।

ড. দেবনাথের বাড়ি থেকে অন্তত পৌনে এক কিলোমিটার দূরে গাড়িটা রাস্তার ধার ঘেঁষে পার্ক করে রাখা আছে। রাস্তার পাশে বড়-বড় গাছ আর জংলা ঝোপ। কয়েকটা কাঠবিড়ালী গাছের শাখা-প্রশাখা বেয়ে ছুটোছুটি করছে। আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি কখনও পড়ছে, কখনও থামছে—তার টাইমটেবিলের কোনও ঠিক নেই।

ছোটকারা বেলা বারোটার পর থেকে ড. দেবনাথের বাড়ির ওপরে নজরদারির কাজ শুরু করেছে। ছোটকার মন বলছিল, অবিনাশ চাকলাদার সিডিটা আজ নেবেই। ও বলে গেছে বিকেল পাঁচটার পর, কিন্তু ছোটকার মনে হয়েছে একটু আগে থেকে নজর রাখলে ক্ষতি কী!

অপেক্ষা করতে-করতে এখন প্রায় বিকেল চারটে। কিন্তু ড. দেবনাথ এখনও কোনও সিগনাল দেননি। তিনি বলেছেন, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই তিনি ছোটকাকে মোবাইল ফোনে ফোন করে খবর দেবেন।

ঝামেলা হঠাৎই চোখের ওপরে হাত বুলিয়ে বলে উঠল, 'আর পারিতেছি না। মম পুঞ্জাক্ষি ব্যা-ব্যা-ব্যা—।'

চন্দ্রকান্ত বলল, 'এই সেরেছে! আবার ওর কথা আটকে গেছে!'

ছোটকা সামনের সিটে বসে ছিল। পিছন ফিরে তাকাল ঝামেলার দিকে : 'কী হয়েছে? পুঞ্জাক্ষি ব্যথা করছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ব্যথা করিতেছে।' ঝামেলা তাড়াতাড়ি জবাব দিল।

ঝামেলার বলের মতো চোখ দুটো আসলে পুঞ্জাক্ষি—মাছি বা মউমাছিদের যেমন থাকে। এই চোখ দিয়ে ঝামেলা এক কিলোমিটার দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। এ ছাড়া ওর শ্রবণক্ষমতাও সাঙ্ঘাতিক। আলট্রাসনিক শব্দও ওর কানে নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে। সেইজন্যই ঝামেলাকে সঙ্গে নিয়ে ছোটকা এত দূর থেকে প্রকাশ দেবনাথের বাড়ির ওপরে নজর রাখছে।

'ঝামেলা, আর-একটু কষ্ট করো—ক্রিমিনাল ধরা পড়লেই তোমার ছুটি।'

এমন সময় চন্দ্র বলল, 'ছোটকা, আমার টয়লেট পেয়ে গেছে—।'

ঝামেলা জিগ্যেস করল, 'বড়, না ছোট?'

চন্দ্র রেগে গিয়ে বলল, 'তুমি জেনে কী করবে? তোমার তো আর ওসব প্রবলেম নেই!'

ইন্দ্র বলল, 'ছোটকা, আমারও পেয়ে গেছে—ছোট।'

ঝামেলা বিরক্ত হয়ে বলল, 'মনুষ্য-দিগের কী যে মারাত্মক প্রবলেম। খালি খাওয়া আর টয়লেট যাওয়া, খাওয়া আর টয়লেট যাওয়া। এই কারণেই রোবটরা মানুষের তুলনায় যার-পর-নাই উন্নত। রোবটদের বাড়িতে রান্নাঘরও থাকে না, বাথরুমও থাকে না। কী অসাধারণ চমৎকার!'

'ঝামেলা, তুমি থামবে!' ছোটকা ধমক দিয়ে উঠল। তারপর চন্দ্র আর ইন্দ্রকে বলল, 'যা, গাড়ি থেকে নেমে ওই ঝোপের মধ্যে সেরে আয়।'

আজ সকালে ড. দেবনাথ ছোটকাকে ফোন করেছিলেন। ফোন করে গতরাতের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানিয়েছেন। সব শোনার পর ছোটকা ন'টা নাগাদ এসে হাজির হয়েছে ড. দেবনাথের বাড়িতে। কিছুক্ষণ আলোচনার পর ওরা ভয়েস অ্যানালিসিস নিয়ে বসেছে।

ঘণ্টাখানেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যা জানা গেল তাতে ছোটকা খুব একটা খুশি হতে পারল না। কারণ, সিডির কণ্ঠস্বর বিশ্লেষণ করে টের পাওয়া গেল তাতে বেশ কয়েকটা হাই ফ্রিকোয়েন্সির অজানা সিগনাল মিশিয়ে দেওয়া রয়েছে। কোনও

অবিনাশ চাকলাদার নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য এইভাবে ড. দেবনাথকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। দুজন স্কলার ও তিনজন বিজ্ঞানীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সিডির কণ্ঠস্বরটা তুলনা করে নিশ্চিত কোনও হদিস পাওয়া গেল না। তবে ড. ওয়াসিম খান, ড. অশোক মিশ্র আর প্রভাস দত্তের গলার সঙ্গে সিডির গলার ফ্রিকোয়েন্সি স্পেক্ট্রামের বেশ মিল পাওয়া গেল।

ছোটকা বলল, 'আমাদের কপালটাই খারাপ। এর ওপরে বেস করে কোনও স্টেপ নেওয়া যায় না। বিশেষ করে এঁরা যখন খুব রেসপেক্টেব্‌ল সায়েন্টিস্ট...।'

ড. দেবনাথও দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশ গলায় বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। ওঁদের কাউকেই আমি কাল রাতের হানাদার বলে ভাবতে পারছি না। তবে ডেডলাইন আজ রাত বারোটা। আর বিকেল পাঁচটার পর অবিনাশ চাকলাদারের সিডি নিতে আসার কথা। ওই যে, সিডিটা আমি রেকর্ড করে রেখে দিয়েছি...' কাছেই একটা টেবিলে রাখা সিডিটা আঙুল দিয়ে দেখালেন প্রকাশ দেবনাথ।

'আপনি অবিনাশ-২০০২-এর কোনও কপি রাখেননি?' ছোটকা জানতে চাইল।

ছোটকার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন ড. দেবনাথ। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তারপর বললেন, 'ওই সিডিটা ছাড়া আর একটা কপিই রেখেছি। সেটা সফটওয়্যার লক করা আছে...।'

নিজের আবিষ্কার কখনও নিঃশেষে নষ্ট করা যায় না। সন্তান যতই খারাপ হোক, পিতৃস্নেহ তাকে আগলে-আগলে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

ছোটকা আর কোনও কথা বলেনি। শুধু ঘুরে-ঘুরে ল্যাব, সফটওয়্যার রুম আর অ্যান্টিচেম্বারটা ভালো করে দেখেছে। গোবিন্দদাসকে দু-চারটে প্রশ্নও করেছে। কিন্তু সেরকম কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত ছোটকা প্রকাশ দেবনাথকে বলেছে, 'আপনি সারাদিন আজ ল্যাবেই থাকবেন। বিশেষ করে পাঁচটার পর আর ল্যাব ছেড়ে একেবারে বেরোবেন না। সন্দেহজনক কেউ ল্যাবে এলেই আমাকে মোবাইল ফোনে কনট্যাক্ট করবেন। আমি আপনার বাড়ির ওপরে কনস্ট্যান্ট ওয়াচ রাখব।'

এখন টাটা সুমোর সামনের সিটে বসে ছোটকা সেই কাজটাই করছিল। তবে এত দূর থেকে ড. দেবনাথের বাড়িটাকে ঠিক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। তবুও সেদিকে তাকিয়ে একটার পর একটা সরু চুরুট খেয়ে যাচ্ছিল।

ঝামেলা ওর পুঞ্জাক্ষি দিয়ে নজরদারির কাজটা ঠিকমতোই করছিল। শুধু তার সঙ্গে টপাটপ করে হাই তুলছিল। ওর মোটেই ঘুম পায় না। ও হাই তোলে হাই তুলতে ওর ভালো লাগে বলে। ছোটকা এ নিয়ে প্রশ্ন করায় ঝামেলা জবাব দিয়েছে, 'কেন, রোবটের কি কোনও হবি থাকতে নেই!'

ছোটকা আর কিছু বলতে ভরসা পায়নি। হাই তোলাটা যে কোনও রোবটের হবি হতে পারে সেটা ছোটকার জানা ছিল না।

ড. দেবনাথের বাড়িতে কেউ ঢুকলে বা বেরোলে ঝামেলা সঙ্গে-সঙ্গে তার বিবরণ শুনিয়ে দিচ্ছে। সেই ধারাবিবরণী শুনে ছোটকা বুঝতে পারছে ঠিক কতজন লোক প্রকাশ দেবনাথের বাড়িতে রয়েছে। বেলা বারোটার পর থেকে বিজ্ঞানী তিনজন বেশ কয়েকবার এলেন, আবার চলে গেলেন। রিসার্চ স্কলার দুজন প্রভাস দত্ত আর মিত্যান রায়চৌধুরি সকাল এগারোটা নাগাদ ল্যাবে এসে ঢুকেছিল। তারপর দুপুর আড়াইটের সময় দুজনে একসঙ্গে টিফিন খেতে বেরিয়েছে। ফিরে এসেছে তিনটে পনেরো নাগাদ। আর তার পর থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

সাড়ে ছ'টার সময় মিত্যান ড. দেবনাথের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ওর গবেষণার কাজ আজকের মতো শেষ। ও চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পর প্রভাস বেরিয়ে এল—রওনা হয়ে গেল বাসস্টপের দিকে।

লক্ষ রাখতে-রাখতে ছোটকারা বিরক্ত হয়ে গেল। ঝলা-পালার ঘুম পাচ্ছিল। তাই থেকে-থেকেই প্যাকেটে করে নিয়ে আসা খাবার মুখে দিয়ে ঘুম তাড়াতে চেষ্টা করছিল।

জল খেতে-খেতে ইন্দ্রকান্ত বলল, 'এভাবে আর পারা যাচ্ছে না, ছোটকা। তখন থেকে বসে আছি—কিছু একটা না হলে ভালো লাগে। খালি ঘুম পাচ্ছে।'

ঝামেলা বলল, 'মানুষের এই থার্ড প্রবলেম—ঘুম। এইজন্যেই কবি বলেছেন, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।'

ছোটকা ধমকে উঠল : 'ঝামেলা, তুমি থামবে! আমরা একটা সিরিয়াস মিশনে...।'

ঝামেলা ছোটকাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এবারে তুমি থামো—একটা গাড়ি এসে গেছে। গাড়িটা ড. দেবনাথের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি মনুষ্যপুঙ্গব শকট হইতে অবতরণ করিতেছে...।'

ঝামেলার কথা শোনামাত্রই সবাই চুপ করে গেল।

ছোটকারা ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। তাই ছোটকা তিওয়ারিকে বলল, রাস্তার ধার ঘেঁষে খুব ধীরে-ধীরে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

গাড়িটা যখন প্রায় দুশো মিটারের মধ্যে চলে এসেছে তখনই ছোটকার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

ছোটকা গাড়িটা থামাতে বলল। তারপর পকেট থেকে ফোন বের করে বোতাম টিপে কানে ধরল।

'হ্যালো, বলুন...।'

'প্রকাশ দেবনাথ বলছি।' ড. দেবনাথের গলা কাঁপছিল : 'এইমাত্র একটা গাড়ি আমার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে...।'

'আপনি চিন্তা করবেন না—আমরা ওয়াচ রাখছি।'

গাড়িটা স্যান্ট্রো বলে চেনা যাচ্ছিল, তবে মানুষটিকে চেনা যাচ্ছিল না। একটা গাছের নিচে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল বলে রাস্তার আলো অনেকটাই আড়াল হয়ে গিয়েছিল। আর গাড়ি থেকে নেমে আসা

লোকটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খাচ্ছিল।

ঝামেলা বলল, 'গাড়িতে আর কেহ নাই। আর লোকটিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না।'

ফোনে প্রকাশ দেবনাথ জানতে চাইলেন, 'আমি এখন কী করব?'

ছোটকা বলল, 'ফোন অফ করবেন না। আমাকে ইনফরমেশান দিতে থাকুন। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো লোকটাই অবিনাশ চাকলাদার। কিন্তু ওকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না।'

হঠাৎই লোকটা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পকেট থেকে কী একটা বের করে কানে চেপে ধরল।

ঝামেলা বলল, 'ব্যক্তিটির ফোন আসিয়াছে...।'

সঙ্গে-সঙ্গে ওরা দেখল, লোকটা ফোন পকেটে রেখে একছুটে ঢুকে গেল প্রকাশ দেবনাথের বাড়িতে।

ছোটকা মোবাইল ফোন কানে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে, যাতে কোনও কথা বা শব্দ কান এড়িয়ে না যায়।

একটু পরেই শুনতে পেল : 'আরে আপনি! আসুন, আসুন...।'

প্রকাশ দেবনাথের গলা। আগন্তুককে স্বাগত জানাচ্ছেন। নিশ্চয়ই লোকটা ওঁর চেনা। কিন্তু কে সে?

আগন্তুকের আবছা গলা শোনা গেল : 'একটা বিশেষ কাজে এসেছি। তবে আমি একা নই—উনিও আছেন...।'

তারপরই ড. দেবনাথ বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী! তার মানে?'

উত্তরে আর-একটা গলা শোনা গেল : 'তার মানে অবিনাশ-২০০২।'

আর তার পরমুহূর্তেই একটা ভারী আঘাতের শব্দ। সেই সঙ্গে একটা চাপা যন্ত্রণার চিৎকার।

টেলিফোনে ড. দেবনাথের গলা আর শোনা গেল না।

ছোটকা সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। বাঁ হাতে ফোনটা কানে চেপে ধরে আছে। ডান হাত পকেটে ঢুকিয়ে বের করে নিল একটা ব্লাস্টার গান। তারপর একরকম ছুটতে শুরু করল ড. দেবনাথের বাড়ি লক্ষ করে।

কিন্তু ছোটকা পঞ্চাশ-ষাট মিটার পেরোতে-না-পেরোতেই তিনজন লোক বেরিয়ে এল প্রকাশ দেবনাথের বাড়ি থেকে। দুজন পায়ে হেঁটে—আর-একজন কাঁধে চড়ে। কারণ প্রকাশ দেবনাথের অসাড় দেহটা একজনের কাঁধে নেতিয়ে দু-ভাঁজ হয়ে ঝুলছে।

চোখের পলকে গাড়ির দরজা খুলে ওরা উঠে বসল। আর গাড়িটা চলতে শুরু করল।

ঝামেলা চেঁচিয়ে বলল, 'পশ্চাদ্ধাবনং অবশ্যম্ভি! পশ্চাদ্ধাবনং অবশ্যম্ভি!'

তিওয়ারি সেই 'দেবভাষা' কী বুঝল কে জানে, তবে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে এক হ্যাঁচকায় সেটা ছুটিয়ে নিয়ে গেল ছোটকার কাছে।

ঝালা-পালা উত্তেজনায় চিৎকার করছিল। চন্দ্রকান্ত সিট টপকে চলে এল সামনে—চট করে খুলে ধরল বাঁদিকের দরজা। ছোটকা ছুটন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

'গাড়িটাকে ফলো করো। কুইক!' ইন্দ্রকান্ত চেঁচিয়ে উঠল।

ছোটকা হাঁফাতে-হাঁফাতে ঝামেলাকে জিগ্যেস করল, 'কাউকে চিনতে পারলে?'

ঝামেলা মাথা নেড়ে বলল, 'না পারু, না পারু! তবে ফোল্ড করা বডিটা ড. দেবনাথের।'

'এটা না বললেও চলত।' ইন্দ্রকান্ত মন্তব্য করল।

তিওয়ারি ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিল। বাঘের মতো হিংস্র চোখে ও তাকিয়ে ছিল সামনের রাস্তার দিকে। সুমোর হ্যালোজেন হেডলাইটে কালো রাস্তা আলো হয়ে উঠেছে।

ছোটকা মোবাইল ফোন পকেটে রেখে বলল, 'ড্রাইভারসাব, ওই গাড়িটাকে ধরা চাই।'

রাস্তার দিকে চোখ রেখেই তিওয়ারি হেসে বলল, 'ইয়ে সাহেবকি বড়া ঝামেলা কঁহা। বস, থোড়া টাইম কি বাত হ্যায়, চুপচাপ ব্যয়ঠকে মেরা কামাল দেখিয়ে।'

দূরে স্যান্ট্রোর ব্যাকলাইট চোখে পড়ছিল। কখনও-কখনও সেটা বাঁক ঘুরে আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। তিওয়ারি গাড়ির স্টিয়ারিং এমনভাবে ম্যানেজ করছিল যে, মনে হচ্ছিল ওটা ওর হাতেরই একটা বাড়তি অংশ। অত বড় গাড়িটাকে লাউডগা সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথে চালিয়ে ও একটার পর একটা গাড়ি ওভারটেক করে যাচ্ছিল। আর স্যান্ট্রোর ব্যাকলাইট ক্রমেই ওদের কাছে আরও বড়, আরও স্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

এ-পথ সে-পথ ঘুরে স্যান্ট্রোটা বাইপাসে এসে পড়ল। আর যেই না পড়া অমনই তিওয়ারি দাঁত বের করে হেসে বলল, 'শালা বুদ্ধু হ্যায়। বাইপাসমে কাহে আ গিয়া! অব তো বচনা নামুমকিন হ্যায়।'

অ্যাক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াল তিওয়ারি। ওর মাথাটা আরও সামনে ঝুঁকে পড়ল। টাটা সুমোর ইঞ্জিন গোঁ-গোঁ শব্দে কানে প্রায় তালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকছিল ঝড়ের মতো।

সল্ট লেক স্টেডিয়াম পেরোনোর পর দুটো গাড়ির দূরত্ব ভীষণ কমে গেল। ঝালা-পালা হাত-পা ছুড়ে 'আরও জোরে, আরও জোরে' বলে চেঁচাতে লাগল। আর ঝামেলা মাথা নেড়ে গম্ভীর গলায় বারবার বলতে লাগল, 'বহুৎ খুব। বহুৎ খুব। শুক্রিয়া। শুক্রিয়া।'

ছোটকা অবাক হয়ে ঝামেলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসব কী উলটোপালটা বলছ! কথাগুলোর মানে জানো?'

ঝামেলা বলল, 'না, জানি না। কেন, কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। এর মানে হলো, "শাবাশ। শাবাশ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।" মানে না জেনে কাকে এসব বলছ?'

'কাউকে না। তিওয়ারিকাকুর হিন্দি শুনে আমারও কেমন উর্দুর বেগ এসে গেল,

গই।'

তিওয়ারির টাটা সুমো তখন স্যান্ট্রোর পাশাপাশি দৌড়চ্ছে। আর একইসঙ্গে বাঁদিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে তিওয়ারি স্যান্ট্রোটাকে চাপতে শুরু করল।

বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায় গাড়ির চাকা গড়িয়ে চলার চড়বড়-চড়বড় শব্দ হচ্ছিল। এবার স্যান্ট্রোটা বাঁদিকে সরতে-সরতে ফুটপাথের গায়ে এসে ব্রেক কষতেই বীভৎস আওয়াজ হলো—যেন কয়েকটা বুনো ঘোড়া একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু তিওয়ারি তাতেও থামল না। ওর গাড়ির বাঁদিকটা ঘষে দিল স্যান্ট্রোর মুখে। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ঘষা লাগার শব্দ হলো। তার সঙ্গে মিশে গেল ভিজে রাস্তায় ভালকানাইজ্‌ড রবার ঘষে যাওয়ার আওয়াজ। টাটা সুমোটাকে পাঁচ-ছ' হাত এগিয়ে নিয়ে সজোরে ব্রেক কষে দাঁড় করাল তিওয়ারি।

ঝালা-পালা ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

স্যান্ট্রোর সামনের একটা চাকা উঠে গেল ফুটপাথে। রাস্তায় পথচারী খুব কম ছিল। তা নইলে দু-চারজন আহত হওয়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না।

তিওয়ারি গাড়ি থেকে নামল। সিটের তলা থেকে একটা লোহার রড বের করে নিল। তারপর নাক উঁচু করে থমকে দাঁড়ানো স্যান্ট্রো গাড়িটাকে লক্ষ করে বলল, 'কেয়া, বাচ্চু, এক চুমা দে দিয়া তো হাওয়া নিকল গই?'

ছোটকা ততক্ষণে ব্লাস্টার উঁচিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে। আর ছোটকার দেখাদেখি ঝালা-পালা আর ঝামেলাও সুমোর পিছনের দরজা খুলে নেমে পড়ল রাস্তায়।

সাত

স্যান্ট্রো গাড়িটার জানলার কাচগুলো কালো হওয়ায় ওভারটেক করার সময় গাড়ির ভেতরটা কিছুই দেখা যায়নি। তাই ড্রাইভারকে দেখার জন্য ছোটকা তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে গেল স্যান্ট্রোর কাছে।

টাটা সুমোর ধাক্কায় স্যান্ট্রোর বডির পাশটা তুবড়ে গিয়েছিল। তাই শত চেষ্টা করেও গাড়ির ড্রাইভার দরজা খুলে বেরোতে পারছিল না। মাথাটা ঝুঁকিয়ে সামনে তাকে ভালো করে চেনাও যাচ্ছিল



না।

তিওয়ারি মারমুখী হয়ে স্যান্ট্রোর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। আচমকা গাড়ির ভেতর থেকে গুলি ছুটে এসে তিওয়ারির বাঁ হাত ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

গুলির শব্দ খুব জোরে শোনা না গেলেও গাড়ির শ্যাটারপ্রুফ কাচ দিয়ে তৈরি উইন্ডশিল্ডটা নিমেষে মাকড়সার জালের মতো হয়ে গেল।

তিওয়ারি একপলক থমকে গেল। রক্তে ভিজে ওঠা বাঁ হাতটা একবার দেখল। তারপর একটা গালাগাল দিয়ে হাতের রডটা ভীষণ জোরে ছুড়ে দিল ড্রাইভারকে লক্ষ করে। ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের কাটা জায়গাটা চেপে ধরল। যন্ত্রণায় ওর মুখ কুঁচকে গেল।

গাড়ির ড্রাইভার বাঁ হাত তুলে রডের আঘাতটা রুখতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারল না। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে আবার গুলি চালাল সে। কিন্তু নিশানা ঠিক না থাকায় সেটা ছুটে গেল অন্ধকার আকাশের দিকে।

ছোটকা ততক্ষণে স্যান্ট্রোর একেবারে পাশে চলে এসেছে।

ব্লাস্টারটা উঁচিয়ে ধরে ছোটকা বলল, 'ছিটেফোঁটা নড়াচড়া করলেই গাড়িসমেত সব ধুলো করে দেব।'

ছোটকার ব্লাস্টারের লেজার পয়েন্টারের লাল আলোটা ড্রাইভারের কপালে টিপের মতো জ্বলছে।

ছোটকা চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'রিভলবারটা ফেলে দিন। তারপর ওপাশের দরজাটা খুলে ধীরে-ধীরে রাস্তায় নেমে আসুন, ড. মিশ্র—নাকি বলব অবিনাশ চাকলাদার?'

ড. অশোক মিশ্র ছোটকার হুকুম অক্ষরে-অক্ষরে পালন করলেন। রিভলবারটা ফেলে দিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়। এবার চোখে পড়ল, তিওয়ারির ছুড়ে দেওয়া রডের আঘাতে ওঁর কপালের ওপরদিকটায় কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে।

দুটো গাড়ি ঘিরে ততক্ষণে লোক জমতে শুরু করেছে। অনেকেরই হাতে ছাতা। কেউ-কেউ আবার বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে মাথায় পলিথিন কিংবা কাগজের আড়াল দিয়েছে।

ঝালা-পালা আর ঝামেলা ভিড় ঠেলে ছোটকার কাছে চলে এল।

ছোটকা পকেট থেকে নিজের আইডেন্টিটি কার্ডটা বের করে উঁচিয়ে ধরল : 'আমরা স্পেশাল ফোর্সের লোক। আপনারা সব দূরে সরে যান—নইলে উল্টেভেড হতে পারেন। প্লিজ, আপনারা দূরে সরে যান।'

ছোটকার কথায় খানিকটা কাজ হলো।

তখন চন্দ্রকান্ত হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'ড. দেবনাথ কোথায় গেলেন, ছোটকা?'

অশোক মিশ্রর দিকে ব্লাস্টার তাক করে ছোটকা রূঢ় গলায় বলল, 'শিগগির এগিয়ে এসে গাড়ির বনেটের ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। ভুলেও পালানোর চেষ্টা করবেন না।'

অশোক মিশ্র কথা শুনতে এতটুকুও দেরি করলেন না। বাধ্য ছেলের মতো স্যান্ট্রোর বনেটের ওপরে শরীরটাকে উপুড় করে দিলেন।

ছোটকা এবার তিওয়ারিকে বলল, 'তিওয়ারি, এই শয়তানটার ওপরে নজর

রাখো। পালাতে চেষ্টা করলেই কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ো...।'

তিওয়ারি ড. মিশ্রর খুব কাছে এসে দাঁড়াল। হেসে জিগ্যেস করল, 'কেয়া, বাচ্চু, ভাগনা হ্যায় কেয়া?' তারপর অশোক মিশ্রর পিঠে ভয়ঙ্কর এক কিল বসিয়ে দিল।

ছোটকা ততক্ষণে ব্লাস্টার তাক করে স্যান্ট্রোর পিছনের দরজা ধরে টান মেরেছে।

দরজা খুলে যেতেই রাস্তার আলোয় ড. প্রকাশ দেবনাথকে দেখা গেল। সিটে কাত হয়ে পড়ে আছেন—দু-চোখ বোজা। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন।

ছোটকা মাথা নিচু করে গাড়ির ভেতরটা ভালো করে দেখতে চাইল। দ্বিতীয় লোকটা কোথায় গেল?

ছোটকার ব্লাস্টার গানের লেজার পয়েন্টারের আলো সেই লোকটার মুখে গিয়ে পড়তেই সে আঁতকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল : 'পি-পি-প্লিজ, ফায়ার করবেন না। ড. দেবনাথ ভালো আছেন...শুধু অ-অ-অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আপনার প-প-পায়ে প-পড়ি, ফায়ার করবেন না!'

ড. দেবনাথকে গাড়ির সিটে ভালো করে শুইয়ে দিয়ে রোবিদাস বাইরে বেরিয়ে এল।

ওকে দেখামাত্রই ছোটকার অঙ্কটা মিলতে শুরু করল।

এই যন্ত্রমানুষটাকে ছোটকা কিংবা প্রকাশ দেবনাথ মানুষের মধ্যেই ধরেননি। তাই ওঁদের হিসেবে ভুল হয়ে গেছে।

অবিনাশ চাকলাদার অবশ্যই অশোক মিশ্র। কিন্তু তাঁকে প্রতিটি ধাপে সাহায্য করে গেছে প্রকাশ দেবনাথের এই 'বুদ্ধিমান' রোবট অ্যাসিস্ট্যান্ট।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই ছোটকা ড. দেবনাথকে পাঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে এল। ঝালা-পালাকে বলল টাটা সুমো থেকে জলের বোতল নিয়ে আসতে। তারপর ফুটপাথের ওপরেই ড. দেবনাথকে শুইয়ে দিল।

কয়েকবার জলের ঝাপটা দিতেই প্রকাশ দেবনাথ চোখ মেললেন। যন্ত্রণার কয়েকটা টুকরো শব্দ বেরিয়ে এল ওঁর মুখ থেকে। কোনওরকমে উঠে বসে তিনি মাথার পিছনটায় হাত বোলাতে লাগলেন।

ছোটকা মোবাইল ফোন বের করে লালবাজারে ডায়াল করে সংক্ষেপে খবর জানাল। অনুরোধ করল যেন একটা ডিটেকটিভ স্কোয়াড আর একটা রেসকিউ ভ্যান এখুনি স্পটে চলে আসে। কারণ, ড. প্রকাশ দেবনাথ একজন ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস সায়েন্টিস্ট।

ছোটকার ফোন করা শেষ হলে ড. দেবনাথ ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ছোটকার কাছ থেকে ব্লাস্টার গানটা চাইলেন।

ছোটকা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'কেন? ব্লাস্টার দিয়ে কী করবেন?'

'এই পাগল অ্যানড্রয়েডটাকে উড়িয়ে দেব। ওর এতবড় সাহস যে, আমার গায়ে হাত তোলে!'

ছোটকা মাথা নাড়ল : 'উঁহু, ভুলেও ও-কাজটি করবেন না। এই কেসে রোবিদাস আমাদের রাজসাক্ষী। কারণ, রোবট কখনও মিথ্যে কথা বলে না।'

ঝামেলা রোবিদাসের কাছে এগিয়ে এসেছিল। ব্লাডহাউন্ডের মতো ও রোবিদাসকে ঘিরে ঘুরপাক খেতে লাগল আর গন্ধ শুঁকতে লাগল।

ঝালা-পালা বলল, 'কী করছ, ঝামেলা—?'

ঝামেলা গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'গন্ধ শুঁকে দেখছি। এই বন্ডেড লেবারটার গায়ে শুঁটকি মাছের মতো দুর্গন্ধ।'

রোবিদাস মুখ ভেংচে বলল, 'ব্যাটা নেড়া চাকর!'

ঝামেলা তখন চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, 'বল তো, পাখির পিঠে পাকা পেঁপে!'

রোবিদাস বারকয়েক 'পা-পা-পা' বলে পালিয়ে গেল গাড়ির আড়ালে।

ছোটকা ঝালা-পালাকে বলল, 'গাড়ির ভেতরে একটা সিডি আছে—খুঁজে বের কর তো! দেখিস, যেন কাচের টুকরোয় হাত-পা না কাটে। আর রিভলভারটা টাচ করবি না—ওতে ড. মিশ্রর আঙুলের ছাপ আছে।'

ঝালা-পালা সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাকশন শুরু করে দিল।

সিডিটা সহজেই পাওয়া গেল। গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে ছিল। সেটা নিয়ে দু-ভাই ছোটকার হাতে এনে জমা দিল।

ছোটকা সবাইকে টাটা সুমোর কাছে ডেকে নিয়ে গেল। স্যান্ট্রোর আড়ালে দাঁড়ানো রোবিদাসকেও ডাকল। শুধু তিওয়ারিকে বলল স্যান্ট্রোর পিছনের সিটে বসে বিশ্রাম নিতে। পুলিশ যে-কোনও সময় এসে পড়বে। তারপরই ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে।

তিওয়ারি হেসে বলল, 'কোনও চিন্তা নাহি, স্যার। হামার কুছু হোয়নি।'

ছোটকা বলল, 'সে জানি। তবে গাড়ির ভেতরে ড. মিশ্রর রিভলবারটা পড়ে আছে। ওটাও তো পাহারা দেওয়া দরকার। তুমি গাড়িতে বসে ওয়েট করো, আমরা কয়েকটা কাজের কথা সেরে নিই।'

ঝালা-পালা আর ঝামেলা টাটা সুমোর কাছে চলে এল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা এখন থেমে গেছে। তবে জোলো বাতাসে গাছপালা নড়ছে। আকাশের পশ্চিম কোণে কালো মেঘের পাহাড়। একটু পরেই আবার হয়তো বৃষ্টি শুরু হবে।

ব্লাস্টার উঁচিয়ে ড. অশোক মিশ্রকেও বড় গাড়িটার কাছে নিয়ে এল ছোটকা। বলল, অকারণে পালানোর চেষ্টা করে তিনি যেন ছোটকাকে দিয়ে খারাপ কাজ না করান। ড. মিশ্র মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রকাশ দেবনাথ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছিঃ, ড. মিশ্র! আপনি এইরকম দেশদ্রোহিতার কাজে নামলেন!'

অশোক মিশ্র কেঁদে ফেললেন। ড. দেবনাথের দু-হাত চেপে ধরলেন। 'আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাজারে আমার লাখ-লাখ টাকা ধার। কীভাবে সেই লোন চুকতা করব সে-কথা ভেবে-ভেবে আমি পাগলা কুত্তা মাফিক হয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় একদিন রোবিদাসের কাছ থেকে আপনার ল্যাবরেটরি কম্পিউটার ডাইরেক্টরির কথা জানতে পারি। তখন আমি প্রকাশের

রাখো। পালাতে চেষ্টা করলেই কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ো...।'

তিওয়ারি ড. মিশ্রর খুব কাছে এসে দাঁড়াল। হেসে জিগ্যেস করল, 'কেয়া, বাচ্চু, ভাগনা হ্যায় কেয়া?' তারপর অশোক মিশ্রর পিঠে ভয়ঙ্কর এক কিল বসিয়ে দিল।

ছোটকা ততক্ষণে ব্লাস্টার তাক করে স্যান্ট্রোর পিছনের দরজা ধরে টান মেরেছে।

দরজা খুলে যেতেই রাস্তার আলোয় ড. প্রকাশ দেবনাথকে দেখা গেল। সিটে কাত হয়ে পড়ে আছেন—দু-চোখ বোজা। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন।

ছোটকা মাথা নিচু করে গাড়ির ভেতরটা ভালো করে দেখতে চাইল। দ্বিতীয় লোকটা কোথায় গেল?

ছোটকার ব্লাস্টার গানের লেজার পয়েন্টারের আলো সেই লোকটার মুখে গিয়ে পড়তেই সে আঁতকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল : 'পি-পি-প্লিজ, ফায়ার করবেন না। ড. দেবনাথ ভালো আছেন...শুধু অ-অ-অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আপনার প-প-পায়ে প-পড়ি, ফায়ার করবেন না!'

ড. দেবনাথকে গাড়ির সিটে ভালো করে শুইয়ে দিয়ে রোবিদাস বাইরে বেরিয়ে এল।

ওকে দেখামাত্রই ছোটকার অঙ্কটা মিলতে শুরু করল।

এই যন্ত্রমানুষটাকে ছোটকা কিংবা প্রকাশ দেবনাথ মানুষের মধ্যেই ধরেননি। তাই ওঁদের হিসেবে ভুল হয়ে গেছে।

অবিনাশ চাকলাদার অবশ্যই অশোক মিশ্র। কিন্তু তাঁকে প্রতিটি ধাপে সাহায্য করে গেছে প্রকাশ দেবনাথের এই 'বুদ্ধিমান' রোবট অ্যাসিস্ট্যান্ট।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই ছোটকা ড. দেবনাথকে পাঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে এল। ঝালা-পালাকে বলল টাটা সুমো থেকে জলের বোতল নিয়ে আসতে। তারপর ফুটপাথের ওপরেই ড. দেবনাথকে শুইয়ে দিল।

কয়েকমুঠো জলের ঝাপটা দিতেই প্রকাশ দেবনাথ চোখ মেললেন। যন্ত্রণার কয়েকটা টুকরো শব্দ বেরিয়ে এল ওঁর মুখ থেকে। কোনওরকমে উঠে বসে তিনি মাথার পিছনটায় হাত বোলাতে লাগলেন।

ছোটকা মোবাইল ফোন বের করে লালবাজারে ডায়াল করে সংক্ষেপে খবর জানাল। অনুরোধ করল যেন একটা ডিটেকটিভ স্কোয়াড আর একটা রেসকিউ ভ্যান এখুনি স্পটে চলে আসে। কারণ, ড. প্রকাশ দেবনাথ একজন ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস সায়েন্টিস্ট।

ছোটকার ফোন করা শেষ হলে ড. দেবনাথ ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ছোটকার কাছ থেকে ব্লাস্টার গানটা চাইলেন।

ছোটকা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'কেন? ব্লাস্টার দিয়ে কী করবেন?'

'এই পাগল অ্যানড্রয়েডটাকে উড়িয়ে দেব। ওর এতবড় সাহস যে, আমার গায়ে হাত তোলে!'

ছোটকা মাথা নাড়ল : 'উঁহু, ভুলেও ও-কাজটি করবেন না। এই কেসে রোবিদাস আমাদের রাজসাক্ষী। কারণ, রোবট কখনও মিথ্যে কথা বলে না।'

ঝামেলা রোবিদাসের কাছে এগিয়ে এসেছিল। ব্লাডহাউন্ডের মতো ও রোবিদাসকে ঘিরে ঘুরপাক খেতে লাগল আর গন্ধ শুঁকতে লাগল।

ঝালা-পালা বলল, 'কী করছ, ঝামেলা—?'

ঝামেলা গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'গন্ধ শুঁকে দেখছি। এই বন্ডেড লেবারটার গায়ে শুঁটকি মাছের মতো দুর্গন্ধ।'

রোবিদাস মুখ ভেংচে বলল, 'ব্যাটা নেড়া চাকর!'

ঝামেলা তখন চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, 'বল তো, পাখির পিঠে পাকা পেঁপে!'

রোবিদাস বারকয়েক 'পা-পা-পা' বলে পালিয়ে গেল গাড়ির আড়ালে।

ছোটকা ঝালা-পালাকে বলল, 'গাড়ির ভেতরে একটা সিডি আছে—খুঁজে বের কর তো! দেখিস, যেন কাচের টুকরোয় হাত-পা না কাটে। আর রিভলবারটা টাচ করবি না—ওতে ড. মিশ্রর আঙুলের ছাপ আছে।'

ঝালা-পালা সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাকশন শুরু করে দিল।

সিডিটা সহজেই পাওয়া গেল। গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে ছিল। সেটা নিয়ে দু-ভাই ছোটকার হাতে এনে জমা দিল।

ছোটকা সবাইকে টাটা সুমোর কাছে ডেকে নিয়ে গেল। স্যান্ট্রোর আড়ালে দাঁড়ানো রোবিদাসকেও ডাকল। শুধু তিওয়ারিকে বলল স্যান্ট্রোর পিছনের সিটে বসে বিশ্রাম নিতে। পুলিশ যে-কোনও সময় এসে পড়বে। তারপরই ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে।

তিওয়ারি হেসে বলল, 'কোনও চিন্তা নাহি, স্যার। হামার কুছু হোয়নি।'

ছোটকা বলল, 'সে জানি। তবে গাড়ির ভেতরে ড. মিশ্রর রিভলবারটা পড়ে আছে। ওটাও তো পাহারা দেওয়া দরকার। তুমি গাড়িতে বসে ওয়েট করো, আমরা কয়েকটা কাজের কথা সেরে নিই।'

ঝালা-পালা আর ঝামেলা টাটা সুমোর কাছে চলে এল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা এখন থেমে গেছে। তবে জোলো বাতাসে গাছপালা নড়ছে। আকাশের পশ্চিম কোণে কালো মেঘের পাহাড়। একটু পরেই আবার হয়তো বৃষ্টি শুরু হবে।

ব্লাস্টার উঁচিয়ে ড. অশোক মিশ্রকেও বড় গাড়িটার কাছে নিয়ে এল ছোটকা। বলল, অকারণে পালানোর চেষ্টা করে তিনি যেন ছোটকাকে দিয়ে খারাপ কাজ না করান। ড. মিশ্র মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রকাশ দেবনাথ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছিঃ, ড. মিশ্র! আপনি এইরকম দেশদ্রোহিতার কাজে নামলেন!'

অশোক মিশ্র কেঁদে ফেললেন। ড. দেবনাথের দু-হাত চেপে ধরলেন। 'আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাজারে আমার লাখ-লাখ টাকা ধার। কীভাবে সেই লোন চুকতা করব সে-কথা ভেবে-ভেবে আমি পাগল কুত্তা মাফিক হয়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় একদিন রোবিদাসের কাছ থেকে আপনার ল্যাবের কম্পিউটার ডাইরেক্টরির কথা জানতে পারি। তখন আমি প্রকাশের

হেল্প নিয়ে রোবিদাসের সঙ্গে স্পেশাল কমিউনিকেশানের ব্যবস্থা করি। তবে প্রভাসকে কিছু বুঝতে দিইনি। ও জানত আমি রিসার্চের জন্যে এসব কাজ করছি। তারপর যা করার সব রোবিদাসের হেল্প নিয়ে করেছি।'

'অবিনাশ-২০০২ হাতিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আপনি কী করতেন?' ছোটকা জিগ্যেস করল।

মাথা ঝাঁকালেন ড. মিশ্র : 'ঠিক জানি না। হয়তো কোনও ইন্টারেস্টেড পার্টিকে বিক্রি করতাম...।'

ছোটকা ড. দেবনাথকে বলল, 'এবার নিশ্চয়ই পুরো গল্পটা বুঝতে পারছেন। আপনার ল্যাবের ভেতরে থেকে রোবিদাস প্রথম থেকেই অশোক মিশ্রকে হেল্প করে গেছে। কারণ, রোবট কখনও তার লজিক দিয়ে দেশদ্রোহিতার মানে বুঝতে পারবে না। বুঝতে পারবে না, কোনও জিনিস বিক্রি করার মানে কী। টাকা রোবটের কাছে শুধুই ছাপা কাগজ। আসলে রোবটের মধ্যে লোভ, হিংসা, ভালোবাসা, প্রভুভক্তি এসব কিছু নেই—থাকা সম্ভব নয়।'

'তার মানে রোবিদাস কুকুরেরও অধম!' ঝামেলা মন্তব্য করল।

'আর তুমি কী?' চন্দ্রকান্ত চাপা গলায় ঝামেলার কানে-কানে জিগ্যেস করল।

ঝামেলা যেন শুনতেই পায়নি এমন ভান করে ছোটকার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রকাশ দেবনাথ এবার সব প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছিলেন।

কে প্রথম অবিনাশ-২০০২-এর কথা জানতে পারে?

কে লিটার বিন থেকে ভাইরাসের নাম লেখা কাগজটা হাতিয়ে নিয়েছিল?

কে মিউজিক সিস্টেমে অন্য সিডি ঢুকিয়ে দিয়েছিল?

অশোক মিশ্রকে সবার অলক্ষ্যে বাড়িতে ঢোকার ব্যবস্থা কে করে দিয়েছে?

আর আজ সন্ধেবেলা ল্যাবে রোবিদাস যে ওঁর মাথায় বাঁ হাত দিয়ে কষে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছে সে তো ড. দেবনাথ ভালো করেই জানেন।

প্রকাশ দেবনাথ মাথার পিছনে একবার হাত বোলালেন। তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে ছোটকাকে বললেন, 'মিস্টার রায়, ভাইরাসের সিডিটা আমাকে দিন।'

ছোটকা সিডিটা দিতেই প্লাস্টিকের খাপ খুলে চকচকে চাকতিটা বের করে নিলেন প্রকাশ দেবনাথ। বললেন, 'অবিনাশ-২০০২-এর এটাই এখন একমাত্র কপি। কারণ, আজ বিকেল চারটের পর আমি আমার পার্সোনাল কপিটা ডেস্ট্রয় করে দিয়েছি। এটাও আর রাখব না। কারণ, লোভ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস।'

কথাটা শেষ করেই সিডিটা জল-কাদার ওপরে ফেলে দিলেন ড. দেবনাথ। ওটাকে পাগলের মতো জুতোয় পিষতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, 'ইট ওয়াজ আ গ্রেট মিসটেক! ইট ওয়াজ আ গ্রেট মিসটেক!'

ছোটকা অবাক চোখে অদ্ভুত দেশপ্রেমী বিজ্ঞানীটির দিকে তাকিয়ে রইল।

ঝামেলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক, অবশেষে সবকিছুর নিষ্পত্তি হইল। আমাকে লইয়াই ভাইরাস প্রবলেমের সূচনা, আবার আমার জন্যেই সমাধান হলো।'

ছোটকা অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে! তুমি একাই সবকিছুর ক্রেডিট নিতে চাও?'

'নাও, তুমি সব নাও। আমার সকল কৃতিত্বের ফল আমি তোমাকে দান করিলাম। আমার প্রবল দুঃখ হইতেছে। হিরোশিমা! হিরোশিমা!'

চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্ত 'ফুজিয়ামা' শুনে অভ্যস্ত। তাই 'হিরোশিমা' শুনে একটু অবাক হলো। চন্দ্র ঝামেলাকে জিগ্যেস করল, 'লাস্টে হিরোশিমা বললে কেন?'

ঝামেলা মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'ওটা গভীর দুঃখের এক্সপ্রেশন। আজ থেকে ইউজ করব ঠিক করেছি।'

এমন সময় একটা পুলিশের জিপ আর একটা ভ্যান ছোটকাদের টাটা সুমোর কাছে এসে দাঁড়াল।

ছবি : জ্যান নাগ